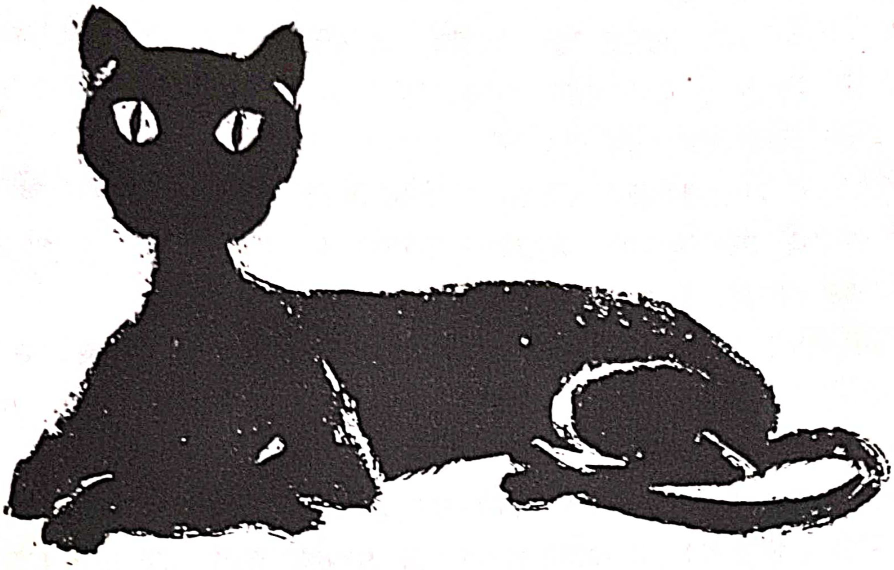
সামান্য ঝুঁকি

অনীশ দেব



অন্যান্য বার মায়ার কাছে এসে বড়জোর দু'দিন কি তিনদিন থেকেছি, তার বেশি নয়। কিন্তু এবারে একেবারে সাতদিনের প্রোগ্রাম। কারণ কী? না সিদ্ধার্থ সাতদিনের জন্যে দিল্লী যাচ্ছে। মায়া যে ভয়-টয় পেয়ে আমাকে সাতদিন থাকার জন্য নেমন্তন্ন করেছে তা নয়। বরং আমিই ওর জন্য দুশ্চিন্তায় পড়েছি। চার বছরের টনিকে নিয়ে ও একা থাকবে। যেখানে একটা পাগল খুনী খুনের নেশায় মত্ত হয়ে এই এলাকায় এলোপাতাড়ি খুন করে বেড়াচ্ছে! তার খুনের ধরন দেখে কাগজওয়ালারা তার নাম দিয়েছে 'আয়রনম্যান'।

খবরের কাগজের অফিসের কাজ বড় ঝামেলার। এক সপ্তা দিনে ডিউটি তো পরের সপ্তায় রাতে। মেয়ে বলে আমাকে নিউজ এডিটর মোটেই খাতির করে না। লোকটার দয়া-মায়া বলে কিছু নেই। একেবারে পাষণ্ড। সেই জন্যেই বোধ হয় এই পাগল খুনীর রহস্য রিপোর্ট করার জন্যে আমাকে লাগিয়ে দিয়েছে।

রোববার দিনটা আমার ছুটি থাকে। তাই সন্ধের দিকে মায়ার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সিদ্ধার্থও বাড়িতেই ছিল। দরজা খুলে আমাকে দেখেই বলে উঠল, 'দিদি, আজ রাতে খেয়ে যাবে—মুরগি এনেছি।' তারপর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মায়া, তোমার গ্রেট এলডার সিস্টার এসেছে—'

সিদ্ধার্থ মুডে থাকলে দারুণ মজা করতে পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ ওকে মন

খারাপ করে বসে থাকতে দেখেছি। মায়া জিজ্ঞেস করলে বলে, 'কিচ্ছু হয়নি।' আজ আমার কপাল ভাল। ওকে দেখে মনে হচ্ছে মেজাজে আছে।

ডিনার টেবিলে বসে তারিয়ে তারিয়ে মুরগির হাড় চিবোচ্ছি, হঠাৎই সিদ্ধার্থ বলল, 'দিদি, কাল আমি দিল্লী যাচ্ছি—বিকেলে ডিলাক্সে—'

আমি খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক'দিনের জন্যে ?'

'সামনের সোমবার এসে যাব।'

'সা-ত-দি-ন !' আমি এত জোরে বলে উঠেছি যে, মায়ার পাশে বসা টনি চমকে উঠেছে, ওর হাত থেকে একটা আলুর টুকরো খসে পড়ে গেছে থালায়। আমি সেসব ভ্রূক্ষেপ না করে বললাম, 'মায়া এ-বাড়িতে একা একা সাতদিন থাকবে !'

কথাটা বলেই মনে হল, এভাবে চেঁচিয়ে না উঠলেই ভাল হত। সিদ্ধার্থ কী মনে করল কে জানে। মায়ার কাছেই শুনেছি, মাঝে মাঝে ও যেরকম হঠাৎ করে মুখে কুলুপ এঁটে বসে পড়ে, তারপর ওর মেজাজ ফেরানোই এক ঝকমারি।

মায়া বোধ হয় একই ভয় করছিল। কারণ, লক্ষ্য করলাম, খেতে খেতেই ও আড়চোখে ওর ভালবাসার মানুষটিকে দেখল একবার। কিন্তু না, সিদ্ধার্থর মুখে আলতো হাসিটুকু লেগেই রইল।

সুতরাং হালকা হয়ে মায়া বলল, 'কেন, টনি রয়েছে না ! ও আমাকে বিপদে-আপদে বাঁচাবে।'

সেইরকমই বটে ! চার বছরের বাচ্চা ছেলে, যে এখনও ভাল করে চাঁদ আর সূর্যের তফাত বুঝতে শেখেনি, সে বাঁচাবে তার মাকে !

আমার খাওয়া তখনও অচল, কপালে বোধ হয় বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। সেটা লক্ষ্য করেই মায়া হয়তো হেসে বলল, 'দিদি, তোর আবার একটু বেশি বেশি। নে, মন দিয়ে খা তো !' তারপর সিদ্ধার্থর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি মিছিমিছি ভেবো না। আমার অত ভয়-টয় নেই।'

ব্যাপারটা 'বেশি বেশি' মোটেই নয়। অন্তত আয়রনম্যানের কীর্তিকলাপ যারা জানে তারা নিশ্চয়ই বুঝবে। গত দেড় মাসে আয়রনম্যান নামের এই পাগল খুনী মোট ছ'ছটা খুন করেছে। ভারী ধাতব কোনও অস্ত্র দিয়ে সে বীভৎসভাবে থেঁতলে দিয়েছে ছ'জন তরুণীর মাথা। আর ঘটনাস্থল থেকে চুরি গেছে তাদের কিছু অন্তর্বাস—অন্তত তাদের বাড়ির লোকেরা সেইরকমই বলেছে জবানবন্দিতে।

প্রথম খুনটা হয়েছিল মুরারিপুকুরের একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে, দেড়মাস আগে। তারপর একে একে শ্যামবাজারে, মানিকতলায়, হাতিবাগান অঞ্চলে দুটো। আর শেষ দুর্ঘটনাটা ঘটেছে অরবিন্দ সেতুর কাছাকাছি—মাত্র দিন দশেক আগে।

মৃত তরুণীদের মধ্যে বেশ কয়েকটা মিল লক্ষ্য করা গেছে। তারা প্রত্যেকেই ঘোর যুবতী, সুন্দরী এবং বিবাহিতা। খুনের সময় তাদের স্বামীরা কেউই বাড়িতে ছিল না। দুজন তো একেবারে কলকাতার বাইরেই গিয়েছিল—সিদ্ধার্থ কাল যেমন যাচ্ছে। আর খুনের সময় তারা কেউই টু শব্দটি করতে পারেনি।

খুনের কায়দাটা মোটামুটি একই। পাঁচিল টপকে কোনও কৌশলে দরজার ছিটকিনি খুলে খুনী ঘরে ঢুকেছে। অথবা, দরজায় আলতো টোকা দিয়ে মেয়েটিকে দরজা খুলতে প্ররোচিত করেছে। কারণ তিনটি খুনের ঘটনায় মৃতদেহ পাওয়া গেছে রক্তাক্ত বিছানায়। হয়তো শিকারকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই খতম করেছে খুনী। আর অন্য তিনটে ঘটনায় মৃতদেহ পড়েছিল দরজার কাছেই, মেঝেতে। আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মেয়েগুলোকে যেন দুরমুশ পেটানো হয়েছে। তারা মারা যাওয়ার পর তাদের ঘর থেকে শায়া অথবা ব্রেসিয়ার, যাহোক কিছু একটা নিয়ে সরে পড়েছে খুনী।

কোনও খুনের ঘটনাতেই কোনও অচেনা হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। ফলে পুলিশের ধারণা, খুনী গ্লাভ্‌স ব্যবহার করেছে। তাছাড়া ছ'জন মেয়ের একজনকেও খুনীর হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়নি। এ পর্যন্ত যে-একটিমাত্র সূত্র পুলিশ পেয়েছে সেটা হল একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান

পাওয়া গেছে। একটি অকুস্থল থেকে সরে পড়ার সময় খুনীকে এক প্রৌঢ় ভদ্রমহিলা দেখে ফেলেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মহিলা লোকটিকে দেখেছেন রাতেরবেলা, চাঁদের আলোয়, এবং পিছন থেকে। যে-মেয়েটি খুন হয় সে তার স্বামীর সঙ্গে মানিকতলায় একতলার একটি ফ্ল্যাটে থাকত। সেই বাড়িরই দোতলার ফ্ল্যাটে থাকেন ওই সাক্ষী ভদ্রমহিলা। ঘটনার দিন রাতে বেড়ালের ঝগড়ায় তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। রাত তখন প্রায় আড়াইটে হবে। সামনের ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াতেই একটি লোককে দেখতে পান তিনি। বাড়ির উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল সে। মহিলাটি এতই ভয় পেয়ে যান যে, চিৎকার করতেও পারেননি।

এই সাক্ষ্যে পুলিশের তেমন কোনও সুবিধে হয়নি। কারণ, শুধুমাত্র পোশাক-আশাক আর চেহারার আন্দাজই দিতে পেরেছেন তিনি। মহিলার কথামত, খুনীর পোশাক ছিল কালো অথবা গাঢ় নীল রঙের। ঢোলা জামা, চাপা প্যান্ট। হাতে ছোট একটা ব্যাগ ছিল। উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট আট-ন' ইঞ্চি, আর ওজন সত্তর কেজি মত হবে।

আমি কিছুটা সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললাম, 'মায়া, আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। তুই-ই বল্, এখান থেকে অরবিন্দ সেতু, মানিকতলা কীই-বা এমন দূর !'

মায়া বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল। তারপর টনির মুখে ভাত গুঁজে দিয়ে বলল, 'আমাকে খুন করা অত সহজ নয়। ভুলে যাস না, আমি এখনও যোগ-ব্যায়াম করি।'

না, এ-কথাটা মিথ্যে নয়। মায়া ছোটবেলা থেকেই যোগব্যায়াম শেখে। তাছাড়া ওর গড়নটাও শক্তপোক্ত। কিন্তু আয়রনম্যানের শক্তির কাছে ওর শক্তি কতটুক !

সিদ্ধার্থ হেসে বলল, 'এলডার সিস্টার, তুমি তোমার ইয়ংগার সিস্টারকে চেনো না। আমার গলায় ঝুলে পড়েছে, আমি জানি এ কী জিনিস। আয়রনম্যানের বাবারও ক্ষমতা নেই এই বস্তুটির গায়ে আঁচড় কাটে।'

মায়া কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'ইয়ারকি না, হাতাহাতি লড়াই হলে তোমাদের মত অনেক ছেলেকে আমি ঘোল খাওয়াতে পারি—'

সিদ্ধার্থ মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম জানানোর ভঙ্গি করে বলল, 'সেটা আমার চেয়ে কে আর ভাল জানে, ম্যাডাম। সেকথাই তো এলডার সিস্টারের মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করছিলাম।'

আমি অল্প হেসেই আবার সামলে নিলাম। বললাম, 'ঠাট্টা নয়। যে-ভদ্রমহিলা খুনীকে দেখেছেন তিনি বলেছেন লোকটার চেহারা বেশ ভাল। এই সিদ্ধার্থর মতই হবে। তার সঙ্গে তুই কী করে—'

সিদ্ধার্থ খাওয়া শেষ করে জলের গেলাস তুলে নিয়েছিল। হাতের একটা ভঙ্গি করে বলল, 'চেহারা আমার মত ! তাহলে তো বেচারার জেতার আর কোনও আশাই দেখছি না—'

মায়া আমার থেকে বছর পাঁচেকের ছোট। বরাবরই খুব লক্ষ্মী মেয়ে। আমার কথা বেশ শোনে। কিন্তু বিয়ের পরই যেন লায়েক হয়ে গেছে। তার ওপর আমি বিয়ে-টিয়ে করিনি বলে আমাকে আর আমলই দিতে চায় না। উলটে ও-ই যেন আমার গার্জেন হয়ে উঠতে চায়।

আমি খাওয়া শেষ করলাম চুপচাপ। সিদ্ধার্থ যেই টেবিল ছেড়ে উঠতে গেছে অমনি ওকে ডেকে বসালাম। সামনে ঝুঁকে পড়ে বেশ গম্ভীর মুখে বললাম, 'সিদ্ধার্থ, তুমি তো জানো, আয়রনম্যানের কেসটা আমি রিপোর্ট করছি। আমাদের কাগজে যেসব খবর ছাপা হয়েছে সেগুলোই সব নয়। পুলিশমহলের রিকোয়েস্টে বেশ কিছু খবর সব কাগজই চেপে গেছে। কারণ তাদের মনে হয়েছে, এই খবর ছাপা হলে গোটা নর্থ ক্যালকাটায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়বে। তার ওপর পলিটিক্যাল চাপ তো আছেই। এই ছ'টা খুন নিয়ে পুলিশের তরফে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তা থেকে বলা যায়, আয়রনম্যান লোকটা শক্তিশালী, নৃশংস, আর ছিটকিনি কাটতে বা হুড়কো খুলতে এক নম্বরের ওস্তাদ। এমনকি দরকার হলে নিঃশব্দে জানলার গ্রিল কেটেও ঢুকে পড়ছে। এরকম একটা অবস্থায়—'

মায়া টনিকে নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল মুখ ধুতে। যাওয়ার আগে আমাকে আর

সিদ্ধার্থকে একপলক দেখে নিল।

সিদ্ধার্থ কয়েক লহমা কী ভাবল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'কী যে করি, অফিসের ট্যুর, না-ও বলা যায় না—'

সিদ্ধার্থ টেবিল ছেড়ে উঠল। সেই সঙ্গে আমিও। মায়া টনিকে মুখ-টুখ মুছিয়ে নিয়ে আমাদের কাছে এল। বলল, 'এবারে দিল্লীতে ইলেট্রনিক্সের নানা জিনিসপত্র দেখাবে। কী এক্সিবিশান আছে। তাই কোম্পানী থেকে ওকে পাঠাচ্ছে।'

টনি মায়ার আঁচল টানছিল আর ঘ্যানর ঘ্যানর করছিল। মায়া 'আসছি' বলে ওকে টেনে নিয়ে গেল শোয়াতে।

সিদ্ধার্থ হাত-মুখ ধুয়ে নিল। তারপর আমিও।

ডাইনিং স্পেসের একপাশে সোফা সেট পাতা। তার মুখোমুখি কিছুটা দূরে টিভি। সিদ্ধার্থ টিভি অন করে দিল। ইংরেজী খবর হচ্ছিল। আমরা দুজনেই সোফায় কিছুটা দূরত্বে বসলাম।

সিদ্ধার্থ বলল, এবারে দিল্লীতে ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যানুয়াল কনভেনশান হচ্ছে। সেই সঙ্গে নতুন নতুন প্রোডাক্টের এক্সিবিশান। আমাদের কোম্পানীও পারটিসিপেট করছে। আমার না গেলেই নয়। তাছাড়া...'

আমি জানি সিদ্ধার্থ কী বলবে। ও শুধু যে একটা ইলেকট্রনিক্স ফার্মের সেল্স অ্যান্ড সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার তা নয়, নিজেও টিভি-ভি.সি.আর. এসব সারানোর কাজ করে।

কোম্পানীর কাজে মাঝে মাঝেই ওকে দু-চারদিনের জন্যে বাইরে যেতে হয়। এবারের এক্সিবিশানে অনেক নতুন নতুন জিনিসও দেখতে পাবে। এ সুযোগ ছাড়া ওর পক্ষে মুশকিল। তবে সাতদিনটা বড্ড বেশি।

সিদ্ধার্থ টিভি-ভি.সি.আর. সারানোর সার্টিফিকেট কোর্স করেছে। ভেবেছিল এই লাইন নিয়েই ব্যবসা ফাঁদবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চাকরিটা পেয়ে যায়। চাকরিটা ওর পছন্দ হওয়ায় মায়া সেটা আর ছাড়তে দেয়নি।

সব মিলিয়ে সিদ্ধার্থর যা আয় তাতে ওদের ছোট্ট সংসার দিব্যি চলে যায়। আড়াইজনের সংসারে কাজের লোক দুজন। একজন ঠিকে, আর একজন রাতদিনের খুকি। তবে সল্ট লেকের এই জায়গাটা এমনিতেই নির্জন। সেখানে মায়া, টনি আর বাচ্চা মেয়েটা থাকবে সাতদিন ?

আমি আর থাকতে পারলাম না। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই বসলাম, 'সিদ্ধার্থ, তুমি কী মনে করবে জানি না। তবে এই সাতদিন আমি মায়ার কাছে থাকব।'

সিদ্ধার্থ টিভির দিক থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একচিলতে হাসল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'সে তো ভালই— তবে তোমার অসুবিধে হবে না তো ?'

আমি বললাম, 'রিপোর্টারদের সবই গা-সওয়া—'

এমন সময় মায়া ঘরে এসে ভুরু উঁচিয়ে জানতে চাইল, কী ব্যাপার ?

ওকে আমার মতলব খুলে বললাম।

ও বলল, 'বাড়িতে অসুবিধে হবে না ?'

বাড়িতে লোক বলতে আমাদের বৃদ্ধ বাবা আর ছোট ভাই অলক। অলক চাকরি করে। এখনও ওর বিয়ে দেওয়া হয়নি, তবে চেষ্টা চলছে। সংসারের দিকে ওর খুব নজর। আমাকেও বেশ কয়েকবার বিয়ের পিঁড়িতে তোলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমার জেদ ভাঙতে পারেনি। আমি জানি আমাকে কীরকম দেখতে। তাছাড়া বিয়ের বয়েসও পেরিয়ে গেছে।

মায়াকে বললাম যে, কোনও অসুবিধেই হবে না, কাল সন্ধের পরই আমি তল্পিতল্পা নিয়ে আসছি।

মায়া বলল, 'তাহলে তো ভালই। আমি একটু ভরসা পাব। তবে তোর ভয় নেই রে, আয়রনম্যান আমাকে কিছু করবে না। লোকটা শুধু সুন্দরী মেয়ে দেখে খুন করে।'

সিদ্ধার্থ টিভি দেখতে দেখতেই ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল বউয়ের দিকে। বলল, 'তাতে তুমি

মোটেই বাদ পড়ছ না।’

সিদ্ধার্থর গলায় ঠাট্টা ছিল না। ভালবাসা ছিল। চোখেও।

মায়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে আদুরে হাসি হাসল। কিন্তু মায়ার চোখ দেখে স্পষ্ট বুঝলাম, নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনওরকম ভুল ধারণা ওর নেই। ও যদি ‘সুন্দরী’ হয়ে থাকে তাহলে সেটা স্রেফ সিদ্ধার্থর চোখেই। যদি একটিমাত্র বিশেষণ ব্যবহার করে মায়ার বর্ণনা দিতে হয় তাহলে আমি এক কথায় ওকে বলব ‘সাদামাটা’। না, মায়া কুৎসিত নয়। তবে নেহাত প্রেমে অন্ধ না হলে ওকে কেউ ‘সুন্দরী’ বলে ভাববে না। এমনিতে চেহারা রোগার দিকে, নাকটা বেশি লম্বা, আর গায়ের রঙ মাজা।

সোজা কথায় ওকে দেখতে আমার মতই। শুধু আমি ওর চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা, আর স্বাস্থ্যও বোধ হয় একটু ভাল। তাছাড়া আমার চোয়ালের হাড় একটু উঁচু হওয়ায় প্রতিযোগিতায় মায়ার কাছে হয়তো আমি হেরেই যাব। সেই জন্যেই কাগজের অফিসে কাজ করতে কখনও অস্বস্তিতে পড়তে হয়নি আমাকে। কেউ আমাকে একা একা দেখা করার নেমন্তন্ন করেননি। সিনেমা দেখাতে চায়নি কেউ। আর অসাবধানে কেউ ধাক্কাও মারে না, আর হাত-টাত চেপেও ধরেনি কখনও। শুনেছি, আড়ালে কেউ কেউ আমাকে পি. টি. ঊষা বলে ডাকে। সেটা নিশ্চয়ই আমার দৌড়ের বাহাদুরির জন্যে নয়।

রূপ না থাকুক, মায়ার গুণ অনেক। ভীষণ সমঝদার, দায়িত্বপরায়ণ, আর কাজপাগল। তাছাড়া ওর ব্যবহারটাও বেশ মিষ্টি। সিদ্ধার্থ মায়ার ব্যাপারে রীতিমত পাগল। সুতরাং সে যে বউকে সুন্দরী দেখবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

সত্যি কথা বলতে কি, যখন হঠাৎই মায়ার সঙ্গে সিদ্ধার্থকে প্রথম দেখি, তখন রীতিমত অবাক হয়েছিলাম। কারণ সিদ্ধার্থর কাঠামো লম্বা, গঠন মজবুত, গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা, মাথায় ঘন কোঁকড়া চুল, সব মিলিয়ে দেবতার মত চেহারা। এছাড়া ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা আলাদা আকর্ষণ রয়েছে যার জন্যে ওকে সবাই ভালবাসে। মেয়েদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, বাবা আর অলকও দেখি সব সময় ওর প্রশংসা করে। মাঝে মাঝে ওর যে-গম্ভীর খামখেয়ালিপনা তাও যেন মোটামুটি মেনে নিয়েছে সবাই।

মায়াকে আমি ভালবাসি। কিন্তু আমার মধ্যেও তো একটা মেয়ে রয়েছে। যে-মেয়েটা চিরটাকাল পুরুষের ভালবাসার কাঙাল হয়ে রইল। যে-মেয়েটার নষ্ট হয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও নেই। সেই জন্যেই হয়তো সিদ্ধার্থ-মায়ার সম্পর্ক জানার পরই একটা নাম-না-জানা গোপন প্রতিক্রিয়া কাজ করেছিল আমার মনে। মায়াকে কি হিংসে করতে শুরু করেছিলাম আমি? মায়ার মত একটা অতি সাদামাটা মেয়ে, যৌবনও যার সাদামাটা, কী করে এই সুপুরুষ সুন্দর যুবককে বেঁধে ফেলল প্রেমের বাঁধনে? এত আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে দুনিয়ায়!

পরে মায়ার কাছে যখন ওদের ব্যাপারটা সবিস্তারে শুনেছি, তখন আমি আর তেমন অবাক হইনি।

‘মন নিকেতন’ নামে একটি মনোরোগ চিকিৎসাকেন্দ্র আছে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে। সেখানে সাইক্রিয়াট্রিক নার্সের কাজ করত মায়া। ওর পড়াশুনো ছিল সাইকোলজি নিয়ে। অনার্স নিয়ে পাশও করেছে। তারপর নার্সিং-এর ট্রেনিং নিয়ে কী করে যেন চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল ওখানে। সে-সময়ে আমার খবরের কাগজের চাকরি বছর চারেকের পুরোন হয়ে গেছে। সুতরাং মায়ার যে চাকরি করাটা খুব দরকারী ছিল, তা নয়, কিন্তু ও আমার বা বাবার বারণ শোনেনি। অলক তখনও পড়াশুনো করছে, ছাত্র। আর মা তো মালা-দেওয়া ছবি হয়ে গেছে সেই কোনকালে।

সুতরাং মায়া লেগে পড়েছিল চাকরিতে। আর বেশ ফূর্তিতেই ছিল।

ওর চাকরি যখন মাস পাঁচ-ছয়েকের পুরোন হয়েছে তখন সিদ্ধার্থ এসে ভর্তি হয় ওই ‘মন নিকেতন’-এ। সিদ্ধার্থ চাকরি করত একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ইরেকশান সাইটে—হলদিয়ায়। সেখানে প্ল্যান্টের প্রায় তের মিটার উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়ে যায় নিচে। কিন্তু আশ্চর্য ভাবেই ও

তেমন আঘাত পায়নি শরীরে। নিচে একটা জাল থাকায় অনেকটা বেঁচে যায়। সুতরাং অল্প ক'দিনেই ও সেরে ওঠে। কিন্তু তখন ধরা পড়ে যে, ওর মনে একটা ভয়ানক ক্ষত রয়ে গেছে। মনের চিকিৎসার জন্য সিদ্ধার্থ কলকাতায় চলে আসে।

মন যাদের ভাঙা তারা ভালবাসা আর অনুভবে ঘেরা জগৎ খুঁজে বেড়ায় প্রাণপণে। মায়ার কাছেই শুনেছি, রুগী আর ডাক্তার যদি দুজনেই পুরুষ অথবা মেয়ে হয় তাহলে তাদের মধ্যে সাময়িকভাবে পিতা-পুত্র বা মা-মেয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, প্যারেন্ট কমপ্লেক্স। আর যদি তাদের একজন পুরুষ আর একজন মেয়ে হয়, তাহলে অনিবার্যভাবেই গড়ে ওঠে এক বিচিত্র ভালবাসার সম্পর্ক। নার্স বা ডাক্তাররা এই ব্যাপারটা বোঝেন, কিন্তু রুগী তখন বোঝার মত অবস্থায় থাকে না। পরে সেরে উঠলে অবশ্য তাদের এই ভ্রম কেটে যায়।

যেসব রুগীর অসুখ তেমন গভীর নয় তাদের জন্য ডাক্তারবাবুরা স্বাভাবিক কারণেই বেশি সময় দেন না। ফলে তাদের 'সম্পর্ক' গড়ে ওঠে নার্সের সঙ্গে। কিন্তু অভিজ্ঞ নার্সরা জানেন, এই সাময়িক ভালবাসা স্রেফ একটা অসুখের ঘোর।

সিদ্ধার্থ যখন প্রথম 'মন নিকেতন'-এ ভর্তি হয় তখন তার মানসিক অবস্থা গোলমেলে ছিল। কিন্তু সামান্য চিকিৎসার পরেই ও আশ্চর্যরকমভাবে দ্রুত সেরে উঠতে থাকে। তখন ওর একমাত্র ওষুধ ছিল ঘুমের ট্যাবলেট আর বিশ্রাম।

মায়া ওর পরিচর্যার দায়িত্বে। সুতরাং সিদ্ধার্থর মন আঁকড়ে ধরেছিল ওকে। মায়া জানত এটা নেহাতই অসুখের ঘোর, অসুখ সেরে গেলেই এই ভালবাসা মিলিয়ে যাবে। এর আগেও এরকম হয়েছে দু-একবার। কিন্তু ওর কাছেই শুনেছি, সিদ্ধার্থ এমনভাবে ওর সঙ্গে কথা বলত, ওর দিকে চেয়ে থাকত যে, সেটাকে নেহাত ঘোর বলে ভাবা মুশকিল ছিল।

সিদ্ধার্থ ক্রমেই সেরে উঠছিল, কিন্তু মায়ার প্রতি ওর ভালবাসার অসুখটা কিছুতেই সারছিল না। মায়া আমাকে একদিন হেসে বলেছিল, 'দিদি, তোকে কী বলব, তখন আমার অবস্থাও খুব খারাপ। সিদ্ধার্থকে একবার না দেখে দশটা মিনিট স্থির থাকতে পারতাম না।'

সেইসময়ে মায়া নাকি মনে মনে ভাবত, 'ঈস, সিদ্ধার্থর এই অসুখের ঘোরটা যদি সত্যি হয়, তাহলে কী দারুণ হয়।'

শেষ পর্যন্ত মায়ার অনুমানই ঠিক দেখা গেল। সিদ্ধার্থ প্রায় সরাসরিই ওকে জানাল নিজের ভালবাসার কথা। তখন মায়ার বয়েস সাতাস, আর সিদ্ধার্থরও তাই। সুতরাং ব্যাপারটা যেন নেহাত ছেলেমানুষী। কচি প্রেম তাও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মায়া ভয় পাচ্ছিল। সিদ্ধার্থর মত একজন রূপবান একজন সুপুরুষ সত্যি সত্যি ওর মত একজন অসুন্দরী সাধারণ মেয়ের প্রেমে পড়বে, এই ব্যাপারটাই ও ঠিক মেনে নিতে পারছিল না। ও ভাবছিল, সিদ্ধার্থর বোধ হয় ঘোর কাটতে দেরি হচ্ছে। তাই ও সিদ্ধার্থকে বলে আরও সময় নিল ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে।

ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থর মা-বাবা নেই। কাকা-কাকীমার কাছে মানুষ। মায়া ওকে বলে, একমাস সিদ্ধার্থ যেন ওর সঙ্গে দেখা না করে, কোনও চিঠিপত্রও না দেয়। তারপরেও যদি সিদ্ধার্থর এই ঘোর না কাটে তাহলে সে যেন কাকা-কাকীমার অনুমতি নিয়ে মায়ার সঙ্গে দেখা করে। তখন মায়া ওকে আর ফেরাবে না।

না, মায়া ফেরাতে পারেনি সিদ্ধার্থকে। ও আটাশ দিনের শেষেই মায়ার কাছে এসে হাজির।

মায়া বলেছিল, 'একমাস তো এখনও হয়নি!'

তার জবাবে সিদ্ধার্থ বলেছিল, 'ধরে নাও না এটা লিপইয়ারের ফেব্রুয়ারি মাস—'

এরপর মায়া আর না বলেনি। আর আমরাও খুশি হয়েই ওদের বিয়ে দিয়েছি।

পুরোন চাকরি থেকে সিদ্ধার্থ পাকাপাকিভাবে ছুটি নিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ইলেকট্রনিক্সে ওর দক্ষতা থাকায় অন্য আর একটা চাকরিও পেয়ে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। একই সঙ্গে টিভি-ভি. সি. আর. রিপেয়ারের একটা সার্টিফিকেট কোর্স করে ফেলল। তারপর সল্ট লেকে এই দোতলা ছোট বাড়িটা ভাড়া নিয়ে গুছিয়ে সংসার পাতল।

সিদ্ধার্থ সংসার সামলে উঠতেই মায়া ওর চাকরি ছেড়ে দিল। শুধু মাঝে মাঝে স্পেশাল কল

পেলে 'মন নিকেতন'-এ যায়। বিয়ের বছর দুয়েক পরেই এল টনি। মায়া মা হয়ে গেল পুরোপুরি। এই সময়ে ওর পেটের রোগ দেখা দেয়। তখন ডাক্তারের পরামর্শ মত ও যোগব্যায়াম শুরু করে। ছোটবেলা থেকেই ও যোগব্যায়াম শিখত, শুধু মাঝে বছর তিনেক ফাঁক পড়েছিল। যাই হোক, তারপর থেকে কখনও ওর শরীর-টরির খারাপ হয়নি।

মন নিয়ে সিদ্ধার্থর সমস্যা এখনও যে ঠিক পুরোপুরি মিটেছে তা নয়। গোলমালটা শ্রেফ মাঝে মাঝে ওর 'মুড অফ' হয়ে যাওয়া। এইটুকুই। সিদ্ধার্থকে এখন কোনওরকম চিকিৎসা করতে হয় না। ওর যেটুকু তদারকি করার তা মায়াই দিব্যি করতে পারে।

সোমবার রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর টিভির সামনে বসে আমি গল্প করছিলাম মায়ার সঙ্গে। টনি ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে। খোলা জানলার পরদার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের অন্ধকার রাত।

সিদ্ধার্থকে স্টেশনে পৌঁছতে যায়নি মায়া। অফিসের গাড়িই ওকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে। আমি তল্পিতল্পা নিয়ে এসে পৌঁছেছি সাড়ে সাতটা নাগাদ। তখন বাড়িতে শুধু মায়া, টনি, আর কাজল নামে কাজের ছোট মেয়েটা।

গল্প করতে করতে কী করে যেন এসে পড়ল আয়রনম্যানের কথা। মায়া বলল, 'আর পারি না! এই বছর দেড়েক আগে গেল স্টোনম্যানের ঝামেলা, আবার এখন আয়রনম্যান। দুটো একই লোক নয়তো রে?'

আমি বললাম, 'না, বরং একেবারেই আলাদা—অন্তত পুলিশের তাই মত।'

তারপর নানা কথার পিঠে আবার এসে গেল সিদ্ধার্থের কথা। মায়াই তুলল। বেশ খুশি মুখে ওদের বিয়ে নিয়ে নানা কথা বলতে লাগল।

এক সময় আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সিদ্ধার্থর মানসিক কোনও গোলমাল এখন আর আছে?'

উত্তর দিতে মায়া এতক্ষণ সময় নিল যে আমি সোজা হয়ে বসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমি কি ওর নরম জায়গায় স্পর্শ করেছি?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে মায়া বলল, 'না, সেরকম কিছু নেই। তবে অ্যাকসিডেন্টে ওর বাইরের চেয়ে ভেতরে আঘাতটা লেগেছিল বেশি। তাছাড়া, আমি তো ওর ব্যাপারটা পুরোপুরি জানি, ওর বরাবরই একটু ইমোশন্যাল প্রবলেম আছে।'

'তার মানে?' আমার ভুরু কুঁচকে গেল।

'মানে—' একটু ইতস্তত করে মায়া বলল, 'অনেকটা স্কিজোফ্রিনিয়া টাইপের।'

'স্কিজোফ্রিনিয়া! সে তো রীতিমত ভয়ের ব্যাপার!'

'দূর, ভয় আবার কী!' মায়া উঠে গেল টিভির কাছে। টিভি অফ করে পাশের জানলার কাছে গেল। পরদা সরিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'মারাত্মক স্কিজোফ্রিনিয়ার রুগী যারা, তাদের নিয়ে ভয় আছে। তবে সিদ্ধার্থেরটা খুবই সামান্য টাইপের। তুই তো টের পাবি না, তোর অফিসেই হয়তো একডজন লোক আছে, যাদের তুই খুব সাধারণ-স্বাভাবিক ভাবিস, দেখা যাবে তাদের হয়তো হালকা স্কিজোফ্রিনিয়ার দোষ আছে।'

আমার দুশ্চিন্তাটা কিছুতেই যেন যেতে চাইছিল না। সেটাই প্রশ্ন হয়ে বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে: 'পরে যদি অসুখটা আরও খারাপের দিকে যায়?'

'তুই যেরকম ভয়ের ভাবছিস এটা সেরকম নয়।' মায়া আমার কাছে এসে বসল। বলল, 'সিদ্ধার্থ এখন যেরকম আছে সেরকমই থাকবে—এর চেয়ে খারাপও হবে না, এর চেয়ে ভালও হবে না। আমি তো ওর ব্যাপারটা গোড়া থেকে জানি, তাছাড়া এতদিন ঘর করছি। ওই শুধু মাঝে মাঝে চুপচাপ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও গোলমাল নেই। ওর মনের ভেতরে আলাদা জগতের মত একটা জায়গা আছে। ও যখন চুপচাপ হয়ে যায় তখন ওই ভেতরের দুনিয়ায় ঢুকে বসে থাকে। এছাড়া আর কোনও প্রবলেম নেই।'

'তোর এত কথার মারপ্যাঁচ আমার মাথায় ঢুকছে না।'

মায়া হেসে আমাকে ছোট্ট ঠেলা মারল একটা, 'ঢোকাতে কে বলেছে।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমাকে ভুল বুঝিস না মায়া—সিদ্ধার্থকে আমি অপছন্দ করি না। তবে...সব জেনেশুনে তুই ওকে কী করে যে বিয়ে করলি...'

মায়া অবাক চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বলল, 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে! আমি ওকে ভালবাসি—'

'এটা কোনও জবাব হল না। জ্যাক দ্য রিপারকে ভালবাসলে তুই তাকে বিয়ে করতে পারতিস?'

'এ-কথার কোনও মানে হয় না।'

আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম, 'রাগ করিস না রে! আসলে তোকে আমি বড্ড বেশি ভালবাসি। আমার শুধু যেটা অবাক লাগছে সেটা হল, সাইকোলজি নিয়ে পড়াশুনো করেও কী করে যে তুই একটা স্কিজোফ্রিনিক-কে বিয়ে করলি—'

'ওঃ, দিদি, সিদ্ধার্থ স্কিজোফ্রিনিক নয়। ওর শুধু সামান্য ওই ধরনের ঝোঁক আছে।'

বুঝতে পারছিলাম, মায়া এবারে বেশ বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু আমারও যে কী হয়েছে। মনে হচ্ছিল, ওকে সিদ্ধার্থ সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করি। ভালবাসা কাকে বলে, সেটা যে আমার জানা নেই। তাই জানতে ইচ্ছে করে ভীষণ।

মায়াকে সহজ করতে হেসে বললাম, 'তা তোর সাহস আছে বলতে হবে। ওর ওইরকম ঝোঁক আছে জেনেও তুই ওকে বিয়ে করার ঝুঁকি নিয়েছিস।'

'মায়া অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।। মনে হল ও বোধ হয় নিজেকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত ও হাসল। খানিকটা অবজ্ঞার হাসি। তারপর বলল, 'নাঃ, তোর ওপরে রাগ করব না। তুই আমাকে সত্যিই ভালবাসিস। তবে একটা পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা যে কী সেটা তুই ঠিক বুঝবি না। তুই বলেছিস ঠিকই, ঝুঁকির ব্যাপারটা আমি চিন্তা করেছিলাম। তবে সিদ্ধার্থ যেরকম পাগলের মত ভালবাসত আমাকে, তাতে ওই চিন্তাটা শেষ পর্যন্ত টেকেনি।'

আমি চোখ মটকে বললাম, 'সামান্য ঝুঁকি তাহলে রয়েই গেছে বল্!'

মায়া ঠোঁট বেঁকাল, বলল, 'তাতে কী! সিদ্ধার্থ ছাড়া আর কোনও ছেলেও তো দ্বিতীয়বার ঘুরে আমাকে দেখেনি—'

আমার কপালে বোধ হয় ভাঁজ পড়েছিল, কারণ মায়া হাত নেড়ে বলে উঠল তড়িঘড়ি, 'আমাকে তুই ভুল বুঝিস না। ভাবিস না যে, বহুকাল আইবুড়ি থেকে ভালবাসার খিদেতে যে-সুযোগ হাতের কাছে পেয়েছি সেটাকেই ঝাঁপিয়ে আঁকড়ে ধরেছি। আমি যদি বিশ্বসুন্দরীও হতাম, তাহলে সিদ্ধার্থর ভালবাসা ফেরাতে পারতাম না। শুধু চেহারাটাই নয়, ওর আরও অনেক গুণ আছে।'

কয়েক সেকেন্ড আমরা চুপচাপ। তারপর সামনের জানলার পরদার দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন জড়ানো গলায় মায়া বলল, 'তুই তো কখনও প্রেমে পড়িসনি! সিদ্ধার্থ যদি বদ্ধ পাগলও হয়, তাহলেও ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ওকে আমি দারুণ ভালবাসি রে। ওর জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি।'

আমার কেমন যেন একটা জেদ চেপে গিয়েছিল। তা না হলে ফস করে বলে বসতাম না 'ও তোকে যদি খুন করতেও আসে, তাহলেও তুই চুপচাপ সেটা মেনে নিবি?'

মায়া হাসল, বলল, 'বুঝেছি, তোর ঝটপট একটা বিয়ের দরকার। সিদ্ধার্থ ফিরে আসুক, ওকে বলছি।'

মায়া হাই তুলে উঠে বসল সোফা ছেড়ে। বলল, 'ওঠ, দশটা বাজে। ঘুম পাচ্ছে—'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে চুল ঝাঁকালাম। এলো চুলটা হাতখোঁপা করে নিলাম। মায়া আমার শরীরের দিকে অদ্ভুত চোখে দেখছিল। হঠাৎই বলল, 'তোর শেষ প্রশ্নের উত্তরটা এখনও দেওয়া হয়নি। মনে হয়, ও যদি খুনী হয়, তাহলে খুন হতে আমার আপত্তি থাকবে না।'

আমার পিঠ বেয়ে দুটো পাহাড়ী কাঁকড়াবিছে নেমে গেল সরসর করে। ওদের পাগুলো যেন

বরফের তৈরি। কী বলছে আমার ছোট বোন!' কল্পনায় দেখতে পেলাম, মায়া ভালবাসামাখা হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর সিদ্ধার্থ ঝুঁকে পড়ে টিপে ধরছে ওর নরম গলা। সিদ্ধার্থর চোখ হিংস্র পাগলের মত বেঁকেচুরে ভয়ানক হয়ে গেছে।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'বাদ দে তো, ঢের হয়েছে। মোদ্দা কথা, তুই ওকে ভালবাসিস, আমিও ওকে পছন্দ করি। সিদ্ধার্থর মত ছেলে হয় না।'

মায়া শোবার ঘরের দিকে হাঁটা দিয়েছিল, আমি ডাকলাম ওকে, 'তোর কাছে পাতিলেবু আছে? থাকলে একগ্লাস শরবত করে খেতাম—'

'রান্নাঘরে আছে। চল্, দিচ্ছি—'

একতলার পিছন দিকটায় রান্নাঘর। বেশ বড়, আর গোছানো। মায়া দুটো গ্লাস রাখল গ্যাস স্টোভের পাশের তাকে। তারপর নিচু হয়ে একটা দেরাজের পাল্লা খুলে ছুরি, চিনি, নুন বের করল। তারপর আমাকে বলল, 'ফ্রিজে পাতিলেবু আছে—'

আমি দূরের কোণে রাখা ফ্রিজ খুলতে গেছি, অমনি নজর গেল সামনের জানলা দিয়ে। থমকে দাঁড়ালাম। মায়াকে বললাম, 'আলো নিভিয়ে এদিকে আয়—'

মায়া অবাক হয়ে দেখল আমাকে। তারপর সুইচ টিপে রান্নাঘরের আলোটা অফ করে দিল। এগিয়ে এল আমার কাছে।

আমাদের সামনেই গ্রিল দেওয়া খোলা জানলা। জানলার পরেই একটা সরু গলি-পথ। তার পরেই আর একটা বাড়ি। বাড়ির একটা জানলা মায়াদের রান্নাঘরের জানলার প্রায় মুখোমুখি।

ও-বাড়ির জানলায় কাচের শার্সি দেওয়া। তবে ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছিল, সেটাও বোধ হয় খেয়াল করেনি।

মেয়েটি বোধ হয় সবে বাইরে থেকে ফিরেছে। এখন পোশাক ছাড়ছে। পরনে সবুজ আর নীলে মেশানো গার্ডেন শাড়ি। গাঢ় নীল ব্লাউজ।

মায়া চাপা গলায় বলল, 'মিসেস কাপুর, মডেলিং করে—'

আমি মিসেস কাপুরকে দেখছিলাম।

লম্বা, ফরসা, অপূর্ব দেহের গঠন। যে-কোনও পুরুষের মাথা চিবিয়ে খেতে পারেন অতি সহজে। চলাফেরায় এক অদ্ভুত পেশাদারী ছন্দ।

শাড়িটা খসে পড়ল মেঝেতে।

মায়া হাত ধরে টানল আমাকে: 'চলে আয়—'

আমি ওকে টেনে দাঁড় করালাম। বললাম, দেখলে ক্ষতি কী!'

না, লুকিয়ে লোকজনের বাড়িতে উঁকি মারা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু কী যে এক কৌতূহল চেপে বসল মাথায়, মনে হল দেখি না। হয়তো অবচেতনে আমার গঠনের সঙ্গে মিসেস কাপুরের গঠনের একটা পার্থক্য দেখার লোভও ছিল।

জামাকাপড় ছাড়তে মিসেস কাপুরের বেশ সময় লাগছিল। কারণ ওঁর সব কাজের মধ্যেই একটা গোছানো কেতা আছে।

পরনের শাড়িটা খুলে উনি সেটা পরিপাটি করে ভাঁজ করতে লাগলেন। আর আমরা দেখতে লাগলাম।

একটু পরে উনি সরে গেলেন জানলার কাছ থেকে। যখন ফিরে এলেন তখন ব্লাউজটা আর নেই। ব্রেসিয়ারের বাঁধনে জোড়া যৌবন উপচে পড়তে চাইছে। ঢেউ খেলানো ফাঁপা চুল থেকে ক্লিপ খুললেন মিসেস কাপুর। মাথা ঝাঁকিয়ে চুল ছড়িয়ে দিলেন বুকে-পিঠে।

'মডেল হওয়ার মতই চেহারা—' আমার গলার স্বর কেমন জড়ানো শোনাল। হঠাৎই টের পেলাম, ঠাণ্ডার আমেজের মধ্যেও ঘাম জমছে হাতের তালুতে।

মাথা ঝুঁকিয়ে ব্রেসিয়ারের সামনের হুক খুলে দিলেন মিসেস কাপুর। তারপর হাত বাঁকিয়ে খুলে ফেললেন অন্তর্বাস। অবিশ্বাস্য গঠনের স্তন সামনে ঝাঁপিয়ে আমাকে অবাক করে দিল। মায়াও নিশ্চয়ই অবাক হয়েছে।

আমার নিশ্বাসে তাপ উঠছিল। হঠাৎই মনে হল, সিদ্ধার্থ কি কখনও এ-দৃশ্য দেখেছে।

এরপর বুকে গলায় বগলে পাউডার মাখতে শুরু করলেন মিসেস কাপুর। পাউডার মাখা হয়ে গেলে একটা হলদে তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে সরে গেলেন জানলা থেকে।

মিনিট তিন-চারেক অপেক্ষা করেও ওঁকে আর দেখতে পেলাম না। মায়া আবার আমার হাত ধরে টানল। বলল, 'চল্ তো, ঢের হয়েছে—'

কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি সরে এলাম। মায়া রান্নাঘরের আলো জ্বেলে শরবত তৈরি করতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিসেস কাপুর প্রায়ই এরকম করে নাকি রে ?'

মায়া চামচ নেড়ে গ্লাসে চিনি গুলতে গুলতে বলল, 'স্বামী বিরাট বিজনেসম্যান। মাসের মধ্যে অর্ধেকদিন বাইরে। গ্ল্যামার গার্ল বউ মডেলিং করে বেড়াচ্ছে। অবশ্য টাকাও আসছে অনেক।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে 'ড্রিম' সাবানের বিজ্ঞাপনে মিসেস কাপুরের ছবি দেখেছি।'

শরবতে চুমুক দিতে দিতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। আবার এসে বসে পড়লাম ডাইনিং স্পেসের সোফায়। বুঝতে পারছিলাম, মিসেস কাপুরকে দেখার পর মায়ার ঘুম সাময়িকভাবে হলেও উবে গেছে।

এবারে আসল কথা জিজ্ঞেস করলাম, 'সিদ্ধার্থ কখনও এ-দৃশ্য দেখেছে ?'

'না দেখার কী আছে!' মায়া হালকা চালে মন্তব্য করল, 'আমিই অনেক সময় ওকে হাতেনাতে ধরেছি।'

'মিসেস কাপুর কখনও জানলায় পরদা টেনে কাপড় ছাড়ে না ?'

মায়া হাসল, বলল, 'হ্যাঁ, যখন ওর স্বামী বাড়িতে থাকে, তখন। মনে হয়, ওর স্বামীই পরদা টেনে দেয়।'

একটু চুপ করে থেকে মায়া আবার বলল, 'সিদ্ধার্থর ধারণা, মিসেস কাপুরের লোক-দেখানোর বাতিক নেই। সেটা হলে হাবভাব দেখে নিশ্চয়ই বোঝা যেত। তাছাড়া, আমি দু-একবার ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। বেশ হাসিখুশি ভদ্র, আর স্বামীকে দিব্যি ভালবাসে বলে মনে হয়। আসলে পরদা টানার ব্যাপারটা হয়তো ঠিক খেয়ালই থাকে না।'

'সিদ্ধার্থ যে ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে, তাতে তোর খারাপ লাগে না ?'

মায়ার হাতের গ্লাস খালি হয়ে গিয়েছিল। আমারটাও। ও গ্লাস দুটো দু-হাতে নিয়ে উঠে পড়ল, বলল, 'কেন, খারাপ লাগবে কেন ? ও তো আর মিসেস কাপুরের সঙ্গে শুতে যাচ্ছে না। বরং এসব দেখলে সিদ্ধার্থর ভালবাসা চাগিয়ে ওঠে—তাতে আমারই লাভ—' মায়া হেসে উঠল খিলখিল করে। তারপর বলল, 'নে, এবারে শুতে যা, কাল সকালেই তো তোকে আবার কাজে বেরোতে হবে—'

অগত্যা উঠে পড়লাম।

রাতে ঘুম আসতে বেশ দেরি হল। চোখের সামনে বার বারই মিসেস কাপুরের শরীরটা ভেসে উঠছিল, আর মনে পড়ছিল আয়রনম্যানের কথা।

পরদিন অফিসে যাওয়ার পথে মায়া আর টনির জন্য আমার দুশ্চিন্তা হতে লাগল। না, দিনের বেলা যে কিছু হবে সে-ভয় আমি পাচ্ছি না। ভাবছি, অফিস থেকে ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়!

নিউজ এডিটর সুদেব চ্যাটার্জিকে বললাম যে, আপাতত আমি দিনসাতেক বোনের বাড়িতে আছি, কোনও এমার্জেন্সী দরকার পড়লে যেন সেখানে খবর পাঠানো হয়।

আয়রনম্যানের ব্যাপারে অফিসে দুটো উড়ো টেলিফোন এল। একজন জানাল যে, সে একটি লোককে আয়রনম্যান বলে সন্দেহ করে, কারণ লোকটা নাকি সবসময় হাতে লোহার রড নিয়ে ঘোরে।

দ্বিতীয় ফোনটি এক মহিলার। তাঁর ধারণা, আজ রাতে তিনিই নাকি আয়রনম্যানের শিকার হবেন।

সুদেব চ্যাটার্জি এগুলো পাত্তা দিলেন না। এরকম উড়ো ফোন প্রায়ই আসে আমাদের দপ্তরে। বরং আমাকে বললেন, লালবাজারে গিয়ে আয়রনম্যানের বিষয়ে নতুন কোনও তথ্য পাওয়া যায় কি না দেখতে।

কথাটা ঠিকই। এখন রোজকার কাগজে আয়রনম্যানের খবর থাকা চাই। তা না হলে কাগজের বিক্রি পড়ে যাবে।

দুপুরবেলার দিকে খবর এল, রেসকোর্সের কাছে একটা গাছতলায় একটা লোক নাকি মরে পড়ে আছে। তার মাথাটা ভারী কিছু দিয়ে থেঁতলানো। বোঝাই যাচ্ছে, আয়রনম্যানের কাজ নয়, কিন্তু তবু সুদেব চ্যাটার্জিকে বললেন, 'তুমি চলে যাও, যেটুকু পার খবর নিয়ে এস। কালকের কাগজে 'স্টোনম্যান' ফিরে এল ?' এই হেডিং দিয়ে মালটা পাবলিককে খাইয়ে দেব। আর ফেরার পথে লালবাজার ঘুরে এস—'

এইভাবে সারাদিনের ধকল সামলে অবশেষে সল্টলেকের পথে। রেসকোর্সের ঘটনাটা বোধ হয় নেহাতই দুর্ঘটনা। কোনও লরি লোকটাকে মেরেছে রাতে। তারপর বডিটা তুলে নিয়ে শুইয়ে দিয়েছে রাস্তার ধারে গাছতলায়।

উল্টোডাঙ্গা-ভি. আই. পি. রোড-এর মোড়ে নেমে পড়লাম কয়েকটা জিনিস কেনাকাটার জন্য। একটা কোল্ড ক্রিম, একটা নেলপালিশ, আর হজমের জন্য এক ফাইল কারমোজাইম। এটা আমাকে থেকে থেকেই খেতে হয়। মাঝে মাঝে বুঝতে পারি, যৌবন-এলাকার পাঁচিল ডিঙিয়ে আমি বোধ হয় ঢুকে পড়তে চলেছি মাঝবয়েসী-এলাকায়।

সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজনের ভিড়, আর গাড়ির স্রোত। কোনও রকমে রাস্তা পার হয়ে বাস-স্টপেজে পৌঁছে গেলাম। একটা ভিড় বাসে ঠেলেঠুলে উঠে পড়লাম। যেতে যেতে মনে হল, আয়রনম্যান তো এই বাসেই থাকতে পারে। লোকটাকে দেখে মনে হবে সুস্থ স্বাভাবিক সংসারী মানুষ। কিন্তু রাতেরবেলাই মানুষটা যাবে পালটে।

মায়ার বাড়ির সামনে নেমে পুরোন কথাটা আবার মনে হল : এলাকাটা বেশ নির্জন। আয়রনম্যানের কাজ সারার পক্ষে আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

একতলায় রাস্তামুখো একটা বড় বারান্দা রয়েছে। গ্রিল দিয়ে ঘেরা। সেখানে টনি তিনচাকার সাইকেল চালাচ্ছিল। আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, 'ভালমাসি, এই দেখ, সাইকেল—' তারপর ওর ছোট ছোট পায়ে প্যাডেল করতে লাগল। এমন সময় কাজল বারান্দায় এসে আমাকে দেখতে পেল। দেখেই, 'দরজা খুলছি' বলে ভেতরে ঢুকে গেল। আমি টনির সাইকেল চালানো দেখছিলাম। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটা! অন্তত ওর জন্য মায়া সিদ্ধার্থর কাছে ঋণী। বাচ্চাটাকে দেখলে বুকের ভেতরে অন্যরকম আকাঙ্ক্ষা জাগে। টনির সাইকেল চালানোয় উৎসাহ দিতে আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম। ও হেসে উঠল খিলখিল করে।

কাজল দরজা খুলে দিয়েছিল। আমি ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতরে। শাঁখের আওয়াজ পেলাম। মায়া 'সন্ধ্যা' দিচ্ছে। অজান্তেই আমার হাত উঠে গেল কপালের কাছে। আর একটা চাপা প্রার্থনাও যেন উঁকি মারতে চাইল। অনেক কষ্টে সেটাকে ঢুকিয়ে দিলাম বুকের ভেতরে।

রান্নাবান্নায় কয়েক ঘণ্টা সময় কেটে গেল চোখের পলকে। তারপর একটু ফুরসত পেয়ে মায়া উলবোনা নিয়ে বসল। টনি শোবার ঘরে কাজলের কাছে। ছবির বই দেখে দেখে 'এ বি সি ডি' পড়ছে। আমি আমার ছোট ঘরটায় এসে চটপট একটা রিপোর্টের কপি তৈরি করে নিলাম। তারপর গালে একটু ক্রিম ঘষে নিয়ে কী করব ভাবছি, হঠাৎই মনে হল ওষুধের শিশিটার মুখটা খুলে রাখি।

প্যাঁচ ঘুরিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের সিলটা ভাঙতে পারলাম না। তখন একটা উপযুক্ত অস্ত্রের জন্য এপাশ-ওপাশ খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। অগত্যা মায়ার শরণাপন্ন হলাম।

মায়া উল বুনছিল বিছানায় বসে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর কাছে স্ক্রু-ড্রাইভার আছে ?'

ও বলল, 'দোতলায় চিলেকোঠায় দেখ। ওটা সিদ্ধার্থর টিভি সারানোর ঘর। ওখানে ছাইপাঁশ

যা চাস সব পাবি। ঘরে ঢুকেই ডানদিকের দেওয়ালে আলোর সুইচ আছে।'

সুতরাং গেলাম দোতলায় স্ক্রু-ড্রাইভারের খোঁজে।

ছাদের ওপর ডানদিক ঘেঁষে আট বাই ছয় মাপের ছোট একটা ঘর। আলো জ্বালতেই ঘরের গোটা চেহারাটা ফুটে উঠল। ঘরের মেঝের একপাশে তার, প্লায়ার্স, হাতুড়ি, সলডারিং আয়রন ইত্যাদি এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া রয়েছে তিনটে চৌকোণা কাঠের বাক্স। তার ভেতরে নানা পার্টসের টুকরো—হয়তো টিভি কিংবা ভি. সি. আর-এর। ঘরের ডানদিকের কোণে একটা টুলের ওপরে বসানো রয়েছে একটা ছোট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি। তার পিছনেই প্লাগ পয়েন্ট।

ঘরের বাঁদিকের দেওয়ালে তিনটে তাক। তাকে তারের কয়েল, টুকিটাকি যন্ত্রপাতি, আর ময়লা কাপড়ের কয়েকটা টুকরো রয়েছে। তাকের পাশেই একটা ছোট কাঠের আলমারি। আলমারির পাল্লা ভেজানো। আলমারির ওপরটা ময়লা, কালচে। সেখানেও কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ল।

ঘরের সিলিং থেকে ঝোলানো একটা তারে লাগানো রয়েছে একটা বাল্‌ব। বাল্‌বের নিচে একটা আধখোলা টিভি সেট। বোধ হয় এটার সারানোর কাজ চলছে।

সব মিলিয়ে ঘরটার চেহারা সত্যিই কোনও মিস্ত্রির ঘরের মত। কিন্তু হলে হবে কী, আমি তো আমার কাজের জিনিসটা খুঁজে পাচ্ছি না!

এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমি এগিয়ে গিয়ে আলমারিটার দরজা খুললাম।

আলমারির দরজা খুলেও যেন সেই একই দৃশ্য। তবু তারই মধ্যে একটা বড় প্লাস্টিক-বাক্স চোখে পড়ল। বাক্সটা খুলতেই একটা স্ক্রু-ড্রাইভার পেয়ে গেলাম। কিন্তু একই সঙ্গে আরও কয়েকটা জিনিস নজরে পড়ল আমার।

একটা খুব সরু আর লম্বা নোজ প্লায়ার্স। একটা সরু হ্যাক স'। একটা লম্বা চ্যাপ্টা স্টিলের পাত। একটা শিশি—শিশিতে জলের মত কী যেন রয়েছে। আর একজোড়া কালো দস্তানা।

শেষ তিনটে জিনিস আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলল। প্রথমে স্টিলের পাতটা চিনতে পারলাম। দরজার হুড়কো বা খিল খোলার কাজে চোর-ছ্যাঁচোড়রা এ-ধরনের জিনিস ব্যবহার করে। মনে পড়ল, একবার লালবাজারে একটা চোরের কাছে এরকম একটা পাত দেখেছিলাম।

শিশির বস্তুটি কী জিনিস সেটা ভাল করে দেখার জন্য শিশিটা তুলে নিলাম হাতে। শিশির ছিপিটা কাঁচের। সেটা খুলতেই গাঢ় সাদা ধোঁয়ার কয়েকটা রেখা বেরিয়ে এল বাইরে। সেই সঙ্গে ঝাঁঝালো গন্ধ। অ্যাসিড নাকি? তাড়াতাড়ি ছিপি বন্ধ করে ওটা আবার জায়গামত রেখে দিলাম।

আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। নোজ প্লায়ার্স, হ্যাক স', স্টিলের পাত, অ্যাসিড, কালো দস্তানা—এসব সিদ্ধার্থর কোন কাজে লাগে?

আমার বুদ্ধি যে সাঙ্ঘাতিকরকম একটা কিছু তা নয়। আবার বুদ্ধিতে যে খুব একটা পিছিয়ে আছি তাও নয়। তবু জিনিসগুলো দেখে প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, সিদ্ধার্থ এসব অদ্ভুত জিনিস দিয়ে কী করছে!

এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়তো অস্বাভাবিক নয়, তবে এই সামান্য কারণেই কোনও সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পড়াটাও নিশ্চয়ই বিবেচনার কাজ নয়। তার ওপর সিদ্ধার্থ যেখানে আমার ভগ্নীপতি। সুতরাং, এইসব কুচিন্তাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা দমফাটা কৌতূহল, নাকি রিপোর্টার হওয়ার সহজাত সন্দেহ-বাতিক অভ্যেস কাজ করতে লাগল আমার মনের মধ্যে। ফলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমি আলমারিটা হাঁটকাতে শুরু করলাম।

আলমারির একেবারে নিচের তাকটা দেখার জন্যে আমাকে মেঝেতে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে হল। ওটা হাতড়ে কয়েকটা বই পেলাম—বেশির ভাগই বোধ হয় ইলেকট্রনিক্সের। তাছাড়া বেশ কয়েকটা ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের টুকরো। কিন্তু কাপড়ের টুকরোগুলো টানাটানি করার

সময়েই বেরিয়ে এল দুটো আধময়লা ব্রেসিয়ার। আরও খোঁজাখুঁজি করতেই পাওয়া গেল দুটো শায়া ও আরও দুটো ব্রেসিয়ার।

চারটে ব্রেসিয়ার খুঁটিয়ে দেখলাম।

চারটে যে চার ধরনের তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আর সেটা বোঝার জন্যে অন্তর্বাস-বিশেষজ্ঞও হওয়ার দরকার নেই। এছাড়া ওগুলোর মাপও সমান নয়।

একবার মনে হল, এই পোশাকগুলো মায়ার নয় তো। কিন্তু আমি ভাল করে জানি, অন্তর্বাসের ব্যাপারে মায়া একটু সেকেলে ধরনের। লেসের স্বচ্ছ কারুকাজ বা সামনে হুক—এসব ওর পছন্দ নয়। অথচ তিনটে ব্রাতেই এরকম ব্যাপার রয়েছে। চার নম্বরটা অবশ্য সাদাসিধে, তবে তার মাপ মায়ার পক্ষে বেশ বড়।

সুতরাং শায়া দুটো নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামালাম না। কিন্তু এই ব্যবহার করা অন্তর্বাসগুলো দেখে আমার হাত-পায়ে মাকড়সা হেঁটে বেড়াতে লাগল।

এইবারে আর মনকে তেমন লাগামে রাখতে পারছিলাম না। ভয়ঙ্কর সব চিন্তা ঘুরতে শুরু করেছে মাথার মধ্যে। কিন্তু যেহেতু সিদ্ধার্থকে আমি পছন্দ করি সেহেতু তুলনায় কিছু সহজ-সরল ব্যাখার কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার একটা ব্যাপার মাথায় এল। না, সিদ্ধার্থ আয়রনম্যান নয়। কারণ, মায়ার কথা অনুযায়ী মিসেস কাপুরকে সিদ্ধার্থ বহুবারই নগ্ন অথবা অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখেছে। মিসেস কাপুর তরুণী এবং সুন্দরী—আয়রনম্যানের শিকাররাও তাই। তাছাড়া সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই জানে, মিস্টার কাপুর ব্যবসার কাজে মাসের অর্ধেকটা সময়ই বাইরে বাইরে কাটান। সুতরাং সিদ্ধার্থই যদি আয়রনম্যান হবে তাহলে মিসেস কাপুরকে এখনও ও খুন করেনি কেন?

প্রশ্নটা মনে জেগে ওঠামাত্রই তার উত্তরটাও উঁকি দিল। উত্তরটা সিদ্ধার্থর পক্ষে সুবিধেজনক নয়। যারা পাগল হয় তারা সবসময় বোকা হয় না। বিদেশে এরকম বহু পাগল খুনীর নজির আছে যারা ভীষণ চালাক ছিল। যেমন, বস্টন স্ট্র্যাংলার, জ্যাক দ্য রিপার এরা। সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই মিসেস কাপুরকে খুন করার মত বোকা নয়। কারণ মিসেস কাপুর ঠিক ওর পাশের বাড়িতেই থাকেন। খুন করার পক্ষে বড় বেশি কাছাকাছি।

তা সত্ত্বেও আমি অন্তর্বাসগুলোর অন্য কোনও ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চেষ্টা করলাম। আর কী কারণে এগুলো এখানে আসতে পারে?

কিন্তু অনেক ভেবেও আর কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না।

এবার আমি ঘেন্না না করে অন্তর্বাসগুলো শুঁকে দেখতে লাগলাম। মানছি, আমার ঘ্রাণশক্তি কুকুরের মত জোরাল নয়, কিন্তু আমি তো মেয়ে! গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারব না এই ছ'টা পোশাক ছ'টি আলাদা মেয়ের কিনা?

অনেকক্ষণ ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করে মাত্র চারটি গন্ধ আলাদা বলে ঠাহর হল।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। আমার দেরি দেখে মায়া কি ওপরে ওঠে আসছে?

সুতরাং যত তাড়াতাড়ি পারি জিনিসগুলো সব জায়গামত রেখে দিলাম।

প্লাস্টিকের বাক্স বন্ধ করে আলমারির পাল্লা ভেজিয়ে দিলাম আবার। স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দরজা টেনে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি, দেখি মায়া চটি ফটফটিয়ে উঠে আসছে ওপরে।

'কী রে, এতক্ষণ লাগছে তোর স্ক্রু-ড্রাইভার খুঁজতে?'

আমি কষ্ট করে হালকা সুর ফোটালাম গলায়, 'বাব্বাঃ, এত সব যন্ত্রপাতির মধ্যে সহজে খুঁজে পাওয়া যায়! তা সিদ্ধার্থ ওর কারখানাটা বানিয়েছে ভাল—'

মায়া আমার আগে আগে নিচে নামতে শুরু করেছিল। বলল, 'হ্যাঁ, এখানকার অনেকেই ওকে টিভি সারাতে ডাকে।'

যে-ছ'টা খুনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর তারিখ সময় সবই আমার জানা আছে। নানান খবরের কাগজে সে-বিষয়ে যেসব রিপোর্ট বেরিয়েছে সেগুলোও অফিসে আমার নিজস্ব একটা

ফাইলে রয়েছে। সুতরাং ওই খুনগুলোর সময় সিদ্ধার্থ কোথায় কোথায় ছিল সেটা কি এখন খুঁজে বের করা সম্ভব, নাকি প্রমাণ করা যাবে!

এটুকু বুঝতে পারছিলাম, খুব ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে এগোতে হবে। পুলিশের কাছে যাওয়ার আগে আমাকে শতকরা একশো ভাগ নিঃসন্দেহ হতে হবে। নিচে নেমে মায়া জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাই, এখন খাবি?'

আমি দেওয়ালে টাঙানো একটা ঘড়ি দেখে বললাম, 'সবে তো ন'টা বাজে। দশটায় ডাকিস—'

মায়া বলল, 'তাহলে টনি আর কাজলকে খেতে দিয়ে দিই। তারপর পারলে হাতের সেলাইটা একটু এগিয়ে নেব।'

মায়া শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। আমিও ঢুকে পড়লাম আমার জন্য বরাদ্দ ঘরে। তারপর স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে ভেঙে ফেললাম কার্মোজাইমের শিশির সিলটা। দু-চামচ ওযুধ খেয়ে গা এলিয়ে দিলাম বিছানায়। কাল স্ক্রু-ড্রাইভারটা রেখে আসার অজুহাতে সিদ্ধার্থর 'কারখানা'য় আর একদফা তল্লাশি চালানো যাবে।

যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে পুলিশে যেতেই হয়, তাহলে দেখতে হবে সিদ্ধার্থকে অ্যারেস্ট করার সময়ে কিংবা কোর্টকাছারি হওয়ার সময়ে কোনওভাবেই যেন আমার নামটা ফাঁস না হয়। আমি চাই না মায়া একটা খুনপাগল লোককে নিয়ে ঘর করুক। আবার এও চাই না, এই ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে ওর সমস্ত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাক। সিদ্ধার্থ সত্যি সত্যি যদি দোষীও হয়, আমি জানি, মায়া কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

সিদ্ধার্থ ফিরছে সামনের সোমবার। ফলে হাতে এখনও দিন সাতেক সময় রয়েছে।

রাতে খাওয়ার সময় মায়াকে জিজ্ঞেস করলাম, টিভি-ভি. সি. আর. এসব সারাতে সিদ্ধার্থ কোথায় কোথায় সাধারণত যায়।

মায়া যেসব জায়গার নাম বলল, তার মধ্যে অরবিন্দ সরণি, মানিকতলা, শ্যামবাজার, মুরারিপুকুর ইত্যাদি রয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে কোন বাড়িতে ও রিপেয়ারিং-এর কাজ করতে যায় তার কোন রেকর্ড আছে?'

মায়া খেতে খেতেই ভুরু কুঁচকে তাকাল : 'কী ব্যাপার বল্ তো, তুই যে হঠাৎ গোয়েন্দার মত প্রশ্ন শুরু করলি!'

আমি অপ্রস্তুতে পড়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, 'না, না, সেরকম কিছু না।' তারপর হেসে বললাম, 'আসলে ভাবছিলাম, এসব রিপেয়ারের কাজ থেকে সিদ্ধার্থ বোধ হয় অনেক টাকা বাড়তি রোজগার করে। তোর কী মজা বল।'

মায়া এবারে সহজ হয়ে হাসল। বলল, 'না রে, সেরকম খুব একটা হয় না। এই সাত আটশো বড়জোর। তাছাড়া, ও তো খুব গোছানো স্বভাবের নয়। কবে কোথায় কাজ করে কিছুই লিখে রাখে না। অনেকে এই সুযোগে পরে বাকী টাকা দেব বলে টাকা মেরে দেয়। ও আবার টাকার জন্য তাগাদা করতে পারে না—লজ্জা পায়। মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে আমাকে বলে, সহধর্মিণী, তুমি মাইরি আমার অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে টাকা আদায়ের কাজে লেগে পড়—। তাহলেই বোঝ!'

বাকী কথাবার্তায় নতুন কিছুই আর জানা গেল না।

রাতে শুতে যাওয়ার আগে লেবুর শরবত করতে গেলাম রান্নাঘরে। মিসেস কাপুরকে আজ আর দেখতে পেলাম না। হয়তো এখনও ফেরেননি, কিংবা আগেই ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কারণ ঘরটা অন্ধকার।

একটু যে হতাশ হলাম সেটা মিথ্যে নয়।

রাতে বিছানায় শুয়ে এলোমেলো চিন্তা করতে লাগলাম। নিজের বোনের ঘর ভাঙব? নাকি আয়রনম্যানের হাত থেকে আরও কয়েকটা অসহায় তরুণীর প্রাণ বাঁচাব? আমার সন্দেহের

স্বপক্ষে এখনও তো নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাইনি। সবটাই সন্দেহ। কিন্তু সিদ্ধার্থ দুটো শায়া আর চারটে ব্রা ওর চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়েই বা রেখেছে কেন?

পরদিন অফিসে গিয়ে প্রথমেই আমার দেরাজ থেকে আয়রনম্যানের ফাইলটা বের করলাম। প্রথম থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কোনও কোনও জায়গায় দরকার মত লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দিলাম। চেষ্টা করলাম, আয়রনম্যানের চরিত্রের একটা আদল খুঁজে পেতে। লোকটার কোন কোন আচরণ কি সিদ্ধার্থর সঙ্গে মেলে?

মনস্তত্ত্ব আমার লাইন নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে মায়ার সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ মনে হচ্ছিল, আমার সমস্ত সন্দেহ-সংশয়ের উত্তর রয়েছে সিদ্ধার্থর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ওপরে।

এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎই ডাঃ রায়চৌধুরীর কথা মনে পড়ল। খুব নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট। আমার তেমন চেনা নয়, তবে আমাদের সুবিনয় ভাল চেনে। সুবিনয় মেডিকেল ব্যাপার-ট্যাপার কভার করে। তার মধ্যে ছ'টা হাসপাতালও রয়েছে।

সুবিনয় ওর ডেস্কে বসে কী একটা রিপোর্ট লিখছিল। বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে। আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, 'এই যে, একটু হেল্প করতে হবে—'

ও মাথা তুলে বলল, 'ও, ঊষা, বল, কী করতে হবে—'

সুবিনয় খুব সিগারেট খায়। গাল ভাঙা, গায়ের রঙ কালো, কপালে অনেক ভাঁজ। বয়েস হয়েছে। তবে চোখ দুটো খুব বুদ্ধিদীপ্ত, কাছে টানে। ও পি. টি. ঊষা বললে আমার খুব রাগ হয় না। অফিসে ও একাই আমাকে সরাসরি ঊষা বলে ডাকে।

আমি বললাম, 'ডাঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে একটু ইনট্রো করিয়ে দাও—'

সুবিনয় কপাল কোঁচকাল, ধোঁয়া ছাড়ল কয়েকবার। বলল, 'কী ব্যাপার বল তো—'

আমি হেসে বললাম, 'তেমন কিছু না। শুধু সাইকোলজির ব্যাপারে একটু জ্ঞান নেব।'

'আয়রনম্যানের ব্যাপারে?'

সুবিনয়কে বোধ হয় বলা যায়। তাই বললাম, 'হ্যাঁ—'

ও চোখ নাচাল, 'কোন নতুন ক্লু নাকি?'

আমি হাসলাম, মুখের কাছে হাত নেড়ে ধোঁয়া তাড়ালাম, বললাম, 'সরি, এখনও ভাঙতে পারছি না।'

সুবিনয় কিছু মনে করল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। বলল, 'এস, ফোনে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

মিনিট দশেকের মধ্যে সুবিনয়ের কাজ শেষ। বুধবার রাত ন'টায় বাড়িতে ডাঃ রায়চৌধুরী আমাকে সময় দিলেন। টেলিফোনে ভদ্রলোকের গলা বেশ গম্ভীর শোনাল। সুবিনয়কে সে কথা বলতেই ও হেসে বলল, 'ঊষা, খবরের কাগজের চাকরি মানে পরের হাঁড়ি হাটে ভেঙে পয়সা রোজগার করা। কিন্তু সব হাঁড়ি তো আমরা হাটে ভাঙি না, হাতে রেখে দিই। তাতে অনেক কাজ হয়। যেমন, ডাঃ রায়চৌধুরী ইন্ডিয়ান মেডিকেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের পোস্ট ছেড়ে দিয়েছেন কেন জানো?

আমি ঘাড় নাড়লাম। না, জানি না।

সুবিনয় নতুন সিগারেট ধরাল। বলল, 'কেউই জানে না, আমি ছাড়া। এই হাঁড়িটা আমি হাটে ভাঙিনি, হাতে রেখেছি। সুতরাং তোমারও কোন ভয় নেই। 'দিনবাণী'র সুবিনয় চাটুজ্যে কাউকে পাঠালে রায়চৌধুরীর বাবাও তার সঙ্গে দেখা করবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হাঁড়ির খবর, শুনি-'

এবারে সুবিনয় চাটুজ্যের হাসির পালা। ও বলল, 'সরি, এখনও ভাঙতে পারছি না—'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিকই, ঢিল মারলে পাটকেল খেতে হয়!'

তারপর ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার ফিরে এলাম আমার ডেস্কে। কাগজের কাটিংগুলো দেখে দেখে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে নিলাম নোটপ্যাডে। কাল রাত ন'টায় ডাঃ রায়চৌধুরীর কাছে

যখন যাব, তখন এই বিষয়গুলো আমাকে জানতে হবে।

ডাঃ চিরঞ্জিত রায়চৌধুরীর বাড়িটা লর্ড সিনহা রোডে। রাত ন'টায় রাস্তাটা এতই নির্জন যে, গা ছমছম করে। মনে হয় এই বুঝি পিছনে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

দু'পাশে যে-ক'টা বাড়ি দেখছি তাদের পাঁচিল-ঘেরা এলাকার ওপিঠে বড় বড় গাছ। অনেকটা বাগানবাড়ি ধরনের। ডাঃ রায়চৌধুরীর বাড়িটাও তাই। বিশাল লোহার দরজা। দুপাশে থাম। তার গায়ে পাথরের ফলক। ফলকে স্পষ্ট ইংরেজী হরফে নাম ও হাতখানেক লম্বা ডিগ্রি লেখা। দরোয়ানকে বলতেই সে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে চলে গেল।

আমি বাড়িটা দেখে আঁচ করতে চাইছিলাম ডাঃ রায়চৌধুরী মানুষটা কীরকম হবে। বড়লোক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আচরণ ?

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ডাক এল। তারপর সোজা ভেতরে। ডাঃ রায়চৌধুরীর ড্রইংরুমের সোফায়।

মানুষটার বয়েস ষাটের কাছাকাছি হবে। চেহারা লম্বা, রোগা। গায়ের রঙ শ্যামলা। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। ঠোঁটে সবসময়েই একটা অহঙ্কার মাখানো হাসির রেখা। তবে চোখ দুটো তীব্র ও মমতা মাখানো।

ছিমছাম ভাবে সাজানো ঘরে দুটো অয়েল পেইন্টিং আর একটা ফুট চারেক লম্বা অল-গ্লাস অ্যাকোয়ারিয়াম। তাতে লাল, কালো, রুপোলি মাছ সাঁতার কাটছে।

ডাঃ রায়চৌধুরী গম্ভীর স্বরে কথা শুরু করলেন, 'আপনি সুবিনয়বাবুর কোলিগ ?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'বলুন কী খাবেন ? চা না কফি ?'

আমি হেসে বললাম, 'ওসবের জন্যে ব্যস্ত হবেন না। এদিকটা বেশ নির্জন। আমি চটপট কথা সেরেই চলে যাব।'

ডাঃ রায়চৌধুরী হাসলেন শব্দ করে। বললেন, 'কী করব বলুন, রাতে ছাড়া আমার সময় হয় না।'

আমি বললাম, 'মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল—'

'পার্সোনাল ?'

হেসে জানালাম, 'অন্তত এখনও সে-অবস্থা হয়নি। আমার প্রশ্নগুলো আয়রনম্যানের বিষয়ে। কারণ আমাদের কাগজে এই ব্যাপারটা আমিই রিপোর্ট করছি।'

ডাঃ রায়চৌধুরীর মুখ গম্ভীর হল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে কী ভেবে তারপর বললেন, 'বলুন, কী জানতে চান—'

'ধরুন বিয়ে-থা করা একটা সংসারী লোক। বউকে বাচ্চাকে দিব্যি ভালবাসে। এরকম একটা লোক কি আয়রনম্যান হতে পারে ?'

মাথার চুলে হাত চালালেন রায়চৌধুরী। সামনের টেবিলে রাখা ক্ল্যাসিক সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'খুব পারে। এরকম বহু নজির আছে আমাদের লাইনে। এমনিতে হয়তো খুব স্বাভাবিক মানুষ, বিয়ে-থা করে সুখী, কিন্তু ডেঞ্জারাস সেক্স ক্রিমিনাল। আপনাদের কাগজে, আর অন্যান্য সব নিউজপেপারে আয়রনম্যানের ব্যাপারটা খুব মনে হয়েছে—'

গলার স্বর নেমে গেল তাঁর। কিছুক্ষণ মগ্ন. চুপচাপ। তারপর—

'—যে লোকটা সংসারে একা। তবে আপনি যেরকম বলছেন সে রকম হওয়াটাও একেবারে অসম্ভব নয়।'

'আমি একটা লোককে আয়রনম্যান বলে সন্দেহ করছি।' একটু থেমে আবার বললাম, 'আপনি বোধ হয় জানেন, লোকটা ভিকটিমদের শায়া-টায়া এইসব চুরি করেছে। মানে পুলিশ তাই বলছে। তা লোকটা কি এইসব জিনিস নিজের কাছে রেখে দিচ্ছে ? মানে...' বার বার কেন যে হোঁচট খাচ্ছি আমি। মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে জোর এনে বললাম, 'ধরুন, লোকটা শায়া-ব্রা

এইসব নিজের কাছে জমিয়ে রাখে। এর কোনও এক্সপ্ল্যানেশান দিতে পারেন ?’

ডাঃ রায়চৌধুরী ধোঁয়া ছাড়লেন কয়েকবার। তারপর বললেন, ‘আমি সাইকিয়াট্রিস্ট, জ্যোতিষী নই, মিস রয়। যদি আপনি আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে বলেন তাহলে চেষ্টা করতে পারি। যেমন, লোকটা হয়তো ওইসব আন্ডার গারমেন্টসকে ভিকট্রি সিম্বল বলে ভাবে। সে যে লড়াইয়ে জিতেছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কিংবা বেচারার হয়তো মহিলাদের অন্তর্বাস জমানোর হবি আছে। ফ্রয়েড সাহেব তো এ-বিষয়ে অনেক কিছু লিখে গেছেন—’

আমি যে তাঁর কথার মাঝখানেই উসখুস করতে শুরু করেছি সেটা ডাঃ রায়চৌধুরী হয়তো খেয়াল করে থাকবেন। তাই হঠাৎই খুব অন্তরঙ্গ সুরে বললেন, ‘মিস রয়, আমার মনে হয়, আপনি কোনও প্রবলেমে পড়েছেন। আপনি তো জানেন, আমাদের প্রফেশনে কথা গোপন রাখাটাই বড় কথা। সুতরাং, আপনি মন খুলে আমাকে সবকিছু বলতে পারেন। তাহলে এই বুড়ো লোকটা—’ নিজের বুকে আঙুল ঠুকলেন তিনি : ‘হয়তো তোমাকে দু-একটা উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার—’

আমার কী যে হল, হঠাৎই চোখের কোণ ভিজে গেল। গলা ধরে এল যেন। বুকে কেমন একটা কষ্ট। আমি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখে দিলাম। ঝাপসা নজরে আড়চোখে দেখলাম, পাকা চুল মানুষটা উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে।

আমি আর পারলাম না। ডাঃ রায়চৌধুরীকে সব খুলে বললাম। আমার অবস্থাটা উনি বোধ হয় বুঝতে পারবেন।

সব শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর বললেন, ‘বল, তোমাকে কীভাবে আমি সাহায্য করতে পারি—’

লক্ষ্য করেছিলাম, আমার মুখে গোটা গল্পটা শুনতে শুনতে তিনি এতটুকু অবাক হননি। মনস্তত্ত্বের রহস্যে-ঘেরা জগতে যাঁদের নিত্য চলাফেরা তাঁরা বোধ হয় সহজে অবাক হন না।

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ‘সিদ্ধার্থর কেস হিস্ট্রিটা আপনি একবার খতিয়ে দেখুন। ‘মন নিকেতন’-এ নিশ্চয়ই আপনার জানা-চেনা আছে। ওর মানসিক রোগের ব্যাপারে আমি আপনার মতামত চাই।’

ডাঃ রায়চৌধুরী অভয় দিয়ে হাসলেন। বললেন, ‘কোনও চিন্তা নেই। তুমি শুধু একটা দিন সময় দাও আমাকে। পরশু সকালে ন’টা নাগাদ আমার চেম্বারে দেখা করো, সব রিপোর্ট পেয়ে যাবে। এই নাও আমার কার্ড, এতে ঠিকানা ফোন-নাম্বার সব আছে—’

আমি হাত বাড়িয়ে ওঁর দেওয়া কার্ডটা নিলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার হাত কাঁপছিল। ডাঃ রায়চৌধুরী কি নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কার করতে পারবেন সিদ্ধার্থর কেস হিস্ট্রি থেকে ? যদি পাওয়া যায়, তাহলে...

মায়ার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগছিল। ওকে আমি ভালবাসি, টনিকেও তাই বিপদ থেকে বাঁচাতে চাইছি। ওরা তো জানে না, ওরা আগ্নেয়গিরির ওপরে নিশ্চিন্তে বসে আছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ন’টায় ডাঃ রায়চৌধুরীর চেম্বারে গেলাম।

সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে একটা পুরোন বাড়ির দোতলায় ওঁর চেম্বার। বাড়ির বাইরেটা যতটা পুরোন ভেতরটা ততটা নয়। চেম্বার সাজানোর মধ্যেও রুচির ছাপ রয়েছে। চেম্বারের বাইরের ঘরে দুজন লোক বসেছিল। বোধ হয় পেশেন্ট। বেয়ারা গোছের একজনের হাতে স্লিপ দিতেই ডাক এল আমার। সুতরাং দুরু দুরু বুকে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

চিরঞ্জিত রায়চৌধুরী হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে : ‘এস, এস, বস—’

আমি সঙ্কুচিতভাবে বসলাম।

উনি বোধ হয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন, ‘বুঝলে, সম্পর্কের চেয়ে একটা মানুষের প্রাণের দাম অনেক বেশি। তুমি কোনও অন্যায় করছ না। তবে এটা মনে রাখবে, কোনও ইনোসেন্ট লোক যেন শাস্তি না পায়—’

আমার বুকের ভেতরে আবার একটা দম আটকানো ভাব মাথা চাড়া দিল।

রায়চৌধুরী চশমা খুলে রাখলেন টেবিলে। বললেন, তোমার ভগ্নীপতির কেস হিস্ট্রি বেশ ইণ্টারেস্টিং। তুমি জানো, সিদ্ধার্থর বাবা ওর মাকে খুন করেছিল—তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছে?'

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এটা তো কখনও মায়ার কাছে শুনিনি। বললাম, 'না, জানি না। এই প্রথম শুনলাম। আমার বোন কখনও বলেনি। অবশ্য ও নাও জানতে পারে—'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কবেকার ঘটনা?'

চশমা আবার চোখে দিলেন ডাঃ রায়চৌধুরী। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'সিদ্ধার্থর তখন মাত্র বার বছর বয়েস। ওরা তালতলায় থাকত। 'মন নিকেতন'-এর ডাঃ পাল ওর কেসের চার্জে ছিলেন। ওঁর কাছেই শুনলাম, সিদ্ধার্থ বলেছে, ওর মা নাকি উচিত শাস্তিই পেয়েছে। সিদ্ধার্থ বাবাকে যেমন ভালবাসত, ঠিক তেমনই ঘেন্না করত ওর মাকে। ওর কথা অনুযায়ী—'

টেবিলে রাখা একটা ভাঁজ করা কাগজ তুলে নিলেন তিনি। সেটা খুলে কী পড়লেন। তারপর কথার খেই ধরে বললেন, 'ওর মা ছিল খুব সুন্দরী, কিন্তু আনফেইথফুল। লুকিয়ে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে ইয়ে, মানে—ডোন্ট মাইন্ড—নানাজনের সঙ্গে বাজে রিলেশন ছিল ওর মায়ের। সিদ্ধার্থ সবই জানত, কিন্তু মায়ের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে চুপ করে থাকত। দু-একবার মায়ের কথার অবাধ্য হয়ে সাঙ্ঘাতিক মারও খেয়েছে। সুতরাং সিদ্ধার্থ একরকম আতঙ্কে চুপ করে থাকত। তারপর একদিন—'

আবার সেই কাগজটা দেখলেন তিনি। আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল।

'—একদিন ওর বাবা সরাসরি দেখে ফেলে ওঁর মায়ের কেলেঙ্কারি। সিদ্ধার্থ জানত সেদিন বাবা কখন ফিরবে। কিন্তু মাকে ইচ্ছে করেই সেটা বলেনি। ব্যস। ওর বাবার বোধ হয় মাথা গরম ছিল। গলা টিপে বউকে খতম করে নিজে ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। সে এক বীভৎস ব্যাপার।'

এর জন্যে কি সিদ্ধার্থর মনে অপরাধবোধ—মানে, একটা গিল্ট কমপ্লেক্স তৈরি হয়?'

কাগজটা ভাঁজ করে আবার টেবিলে রেখে দিলেন তিনি। হেসে বললেন, 'তোমাদের রিপোর্টারদের নিয়ে এই এক ঝামেলা। সবসময়েই থ্রিলিং এক্সপ্ল্যানেশান খোঁজ। না, না, ডাঃ পাল পরিষ্কার বলেছেন কোনওরকম গিল্ট কমপ্লেক্স ছিল না। আর মনের গোলমাল থাকলেই যে গিল্ট কমপ্লেক্স থাকতে হবে তাই বা কে বলেছে। এটা ঠিক যে, বাবা মারা যাওয়ায় সিদ্ধার্থ খুবই দুঃখ পেয়েছিল, সবসময়ই বাবার মৃত্যুর জন্যে ওর মাকে দায়ী করেছে। আর মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারে ওর যে ইনডায়রেক্ট হাত ছিল তার জন্যে ওর গর্ব হয়। ও ভাবে যে, পাপের জঞ্জাল অন্তত কিছুটা ও সাফ করতে পেরেছে।'

আমি কী বলব ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কোনরকমে বললাম, 'গিল্ট কমপ্লেক্স যদি না হয়, তাহলে কী?'

মাথার চুলে হাত চালালেন ডাঃ রায়চৌধুরী। সকালের রোদ জানলা দিয়ে তেরচাভাবে এসে পড়েছে টেবিলে। রোদের বর্শায় সূক্ষ্ম অণু-পরমাণু উড়ছে। সেদিকে একবার দেখে গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'এইসব ব্যাপার কখনোই খুব সহজ-সরল হয় না। সিদ্ধার্থর মনের ভেতরে হয়তো হাজার রকম জটিল মারপ্যাঁচ রয়েছে। তবে একটা ব্যাপার আমার কাছে খুব স্পষ্ট মনে হচ্ছে: সুন্দরী মহিলাদের ও এতটুকু বিশ্বাস করে না। তুমি কিছু মনে কর না। আমার ধারণা যদি ভুল না হয়, তাহলে তোমার বোন বোধ হয় তেমন সুন্দরী নয়—'

আমি কোলের ওপরে রাখা হাতব্যাগের দিকে একবার তাকালাম। তারপর মুখ তুলে বললাম, 'ঠিকই ধরেছেন। মায়া একেবারে সাদামাটা দেখতে—আমারই মতন।'

'হ্যাঁ, হয়তো সেইজন্যেই সিদ্ধার্থ মায়াকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। ওর বিশ্বাস, মায়া ওকে কখনও ঠকাবে না।'

'তার মানে সুন্দরী মেয়েদের ও ঘেন্না করে? যখনই ও কোনও সুন্দরী বিবাহিতা মেয়েকে

মাথা থেঁৎলে দিয়ে খুন করে, তখনই ও মনে মনে ধরে নেয় যে ও—'

'ওর মাকে উচিত শাস্তি দিচ্ছে। দুনিয়া থেকে পাপের জঞ্জাল সাফ করছে।' আমার মুখের কথা একরকম কেড়ে নিয়েই ডাঃ রায়চৌধুরী বললেন।

আমার মুখে বোধ হয় সামান্য একটু আশা-প্রত্যাশা ফুটে উঠেছিল। সেটা লক্ষ্য করেই তিনি বললেন, 'শোন, আমি যা বলছি, তার সবই প্রায় থিওরিটিক্যাল। সিদ্ধার্থর সঙ্গে দিন সাতেক সিটিং দিতে পারলে হয়তো আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম। এখন যা বলছি তার অনেকটাই যেন পরের মুখে ঝাল খাওয়া। তোমার সন্দেহ যদি সত্যি হয়, মানে, সিদ্ধার্থই যদি আয়রনম্যান হয়, তাহলে আমি হয়তো জিজ্ঞাসাবাদ করে ওর কাছ থেকে খুনের মোটিভও বের করে ফেলতে পারব—'

আমি আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হতেই ডাঃ রায়চৌধুরীর কথা শুনতে পেলাম। উনি তখন বলছিলেন—'একটা কথা মোটামুটি শিওর হয়ে বলা যায়। যদি খুন হওয়া মেয়েগুলোকে ও ওর মায়ের বদলি ভেবেই খুন করে থাকে, তাহলে মেয়েগুলো শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না, ওদের চরিত্রও খারাপ হওয়া জরুরী—ওর মায়ের মত—'

আমি বললাম, 'হতে পারে। কারণ ছ'টা মেয়েই ম্যারেড ছিল।'

চশমার কাচ মুছে রায়চৌধুরী ধীরে ধীরে বললেন, 'তা যদি হয়ও তাহলে সিদ্ধার্থ সেটা কী করে জানবে? কারণ যতদূর জানি, খুন হওয়া মেয়েগুলোর মধ্যে কোনও কানেকশান ছিল না। সুতরাং ছ-ছ'টা বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে সিদ্ধার্থর আলাপ হবে, এমন ঘনিষ্ঠতা হবে যে ও জেনে ফেলবে ওরা আনফেইথফুল—এটা ইম্‌পসিব্‌ল—একেবারে গল্পের মত শোনাচ্ছে—'

আমার মাথায় পরপর যেন বাজ পড়ল কয়েকটা। চোখের সামনে নেচে উঠল সরষে ফুলের ঝাঁক। উত্তেজিতভাবে বলে উঠলাম, 'গল্প হবে কেন? ও তো বাড়ি বাড়ি টিভি-ভি. সি. আর. এসব সারানোর কাজ করে।'

ভুরু কুঁচকে গেল ডাঃ রায়চৌধুরীর। জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে?'

আমি তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম।

'সিদ্ধার্থ চাকরি ছাড়াও এসব রিপেয়ারের কাজ করে। সন্ধেবেলা বা রাত্রিবেলা ও এসব সারাতে-টারাতে যায়। তখন হয়তো এইসব মহিলাদের চরিত্রের ব্যাপার ও জেনে থাকবে। ওর যা চেহারা! যেন শ্বেতপাথরে খোদাই করা পুরুষালি মূর্তি। ইচ্ছে করলে ও সিনেমাতেও নামতে পারত। ওকে একা পেয়ে কোনও মেয়ে নষ্টামি করতেও পারে।'

ঠোঁট ওলটালেন ডাক্তারবাবু। কাঁধ নাচালেন ছোট করে। বললেন, 'তাহলে তখনই তো সেই মেয়েটিকে খতম করতে পারত।'

আমি যে ক্রমেই সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে ওকালতি করতে শুরু করেছি। চট করে জবাব দিলাম, 'তখন হয়তো সুযোগ পায়নি। হয়তো বাড়িতে লোকজন ছিল, বাচ্চা-কাচ্চা ছিল। তাছাড়া বাড়িতে ওর আসা-যাওয়া সবাই দেখে ফেলেছে। এমনও হতে পারে, ওইসব মেয়েদের ইশারায় ও সাড়া দিয়ে পরে একদিন রাতে, দেখা করবে বলেছে। তখন রাস্তা সাফ পেয়েছে। আর ব্যস, নিশ্চিন্তে কাজ হাসিল করেছে। মেয়েরা ওর অভিনয় ধরতে পারেনি।'

'ছ'-ছ'টা মেয়েই ওর সঙ্গে প্রেম করতে চেয়েছিল বলছ?'

প্রশ্নটায় সন্দেহের সুর ছিল। তাই বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, 'না, হয়তো কয়েকজনের বেলায় তাই। আর অন্যদের বেলায় সিদ্ধার্থ হয়তো অবৈধ প্রেমের কোনও সূত্র পেয়েছে—'

আবার তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ বুজে কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে তিনি বললেন, 'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। সিদ্ধার্থর সঙ্গে সিটিং না দিয়ে আমি তোমাকে এর বেশি কিছু বলতে পারছি না।' একটু থেমে শান্ত গলায় বললেন, 'এবারে তুমি যা ভাল বোঝ কর—উইশ য়ু বেস্ট অব লাক।'

আমি খুব দ্রুত ভেবে নিলাম। আর নয়, এবারে লালবাজারে যাওয়া উচিত। ডাঃ রায়চৌধুরীকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসছি, উনি পিছন থেকে আমাকে ডেকে বললেন, 'আই

অলসো ফিল ফর য়ু।'

আমি ওঁর দিকে ফিরে মুখে এক চিলতে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম ওঁর চেম্বার ছেড়ে।

আয়রনম্যানের কেসটার দায়িত্বে রয়েছে ডিটেকটিভ ডিপার্টপেন্টের ইন্সপেক্টর সরকার। সুতরাং রায়চৌধুরীর চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেলাম লালবাজারে, সরকারের কাছে।

শক্তপোক্ত দশাসই চেহারা, এখনও বোধ হয় ব্যায়াম-ট্যায়াম করে। কথা বলে জোরে জোরে। বয়েস পঞ্চাশের এদিকেই। পুরুষ্টু গোঁফে পাক ধরেছে। মাথার চুলেও। শরীরের তুলনায় চোখ ছোট ছোট। আর কথাবার্তায় কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব।

সরকারকে ওর সিটেই পেলাম। দু-তিনটি ফাইল খুলে কাগজপত্র ছড়িয়ে কী যেন করছে। মুখ তুলে আমাকে দেখে হাসল। বলল, 'বলুন, কী চাই? আয়রনম্যানের নতুন কোনও খবর নেই। আরও দু-চারটে লাশ না পড়লে ও শালা ধরা পড়বে না।'

আমি বসে কয়েক মিনিট দম নিলাম। ভাবলাম, বলব কি বলব না। টনির হাসিখুশি মুখটা মনে পড়ল, আর মায়ার সুখী মুখটাও। কিন্তু তারপরই আয়রনম্যানের ভয়ঙ্কর বিকৃত রক্তলোভী মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল!

চাপা গলায় বললাম, 'মিস্টার সরকার, আয়রনম্যানের কেসের ব্যাপারে একটা মোক্ষম ক্লু দিতে পারি।'

'তাই?' কাজ থামাল না সরকার। আমার দিকে এক পলক দেখে আবার কাজে মন দিল।

বুঝলাম, আয়রনম্যানের ব্যাপারটা শুরু হওয়ার পর বহু লোক এসে এরকম বহু 'মোক্ষম' সূত্র জানিয়ে গেছে সরকারের কাছে।

আমি কিছুটা আহত হয়েছিলাম। তাই পরের কথাগুলো একটু জোর দিয়েই বললাম।

'মিস্টার সরকার, প্লিজ, আমি ঠাট্টা করছি না—'

এবারে কাজ থামাল। হাত দিয়ে ঠেলে কাগজপত্র সরিয়ে দিল একপাশে। বলল, 'বলুন, কী ক্লু?'

আমাদের কাগজে লালবাজারের খবরাখবর যা ছাপা হয় সবই আমি লিখি। তাই এখানে যাতায়াত বেশ কয়েক বছরের। প্রথম প্রথম মেয়ে বলে অস্বস্তি হত। পরে মনে হয়েছে, আমি নিজেকে যতটা মেয়ে বলে ভাবি, পুরুষরা বোধ হয় ততটা নয়। অন্তত সরকারের কথাবার্তায় কখনও আমার মনে হয়নি, ও কোনও মহিলা-সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলছে। তবে একটা ব্যাপার আছে। কেন জানি না, ও সব সময় আমাকে পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু আমি আজ নাছোড়াবান্দা।

আমি বললাম, 'সব বলছি, কিন্তু—একটা কন্ডিশান আছে।'

সরকার হেসে হাত নাড়ল। বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনার কাগজ এক্সক্লুসিভ স্টোরি পাবে, কোনও চিন্তা নেই।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, তা না। এই ক্লু আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন কেউ যেন জানতে না পারে—'

এমন সময় সরকারের সহযোগী ইন্সপেক্টর দাসচৌধুরী ঢুকে পড়ল ঘরে। আমাকে দেখে হাসল, বলল, 'কী, আয়রনম্যানের কেসের উওম্যান রিপোর্টার, কেমন আছেন?'

আমি বললাম, 'ভাল আর থাকতে দিলেন কোথায়! আয়রনম্যান ধরা পড়লে তবে শান্তি—'

দাসচৌধুরী বলল, 'সে আর বলতে, পাবলিক আর মিনিস্টার ডেইলি আমাদের মুণ্ডুপাত করছে।'

তারপর সে সরকারের সঙ্গে কয়েকটা কাজের কথা বলে চলে গেল।

সরকার আবার আমার দিকে মনোযোগ দিল। বলল, 'শর্ত মঞ্জুর। এবারে বলুন—'

আমি বললাম, 'আরও একটু ব্যাপার আছে। এই কেসের কোন ব্যাপারে আমার নাম যেন না

ওঠে। আমি একেবারে আড়ালে থাকতে চাই—'

সরকারের চোখেমুখে চিন্তার ছাপ পড়ল। বলল, 'সেটা কি সম্ভব ? কেসে আপনার এভিডেন্স লাগতে পারে—'

আমি বললাম, 'লাগবে না। ধরে নিন না আমি একজন ইনফরমার—'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা। তারপর—

'ঠিক আছে। আয়রনম্যানকে গারদে ভরতে পারলে আমি আর কিছু চাই না। এবারে বলুন—'

আমি বুঝতে পারছিলাম, সরকার ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। কারণটা খুব সহজ। আয়রনম্যান ধরা পড়লে তার নাম হবে, প্রোমোশন হবে, খবরের কাগজেও ছাপা হবে ওর কৃতিত্বের কথা।

আমি গোটা গল্পটা ওকে খুলে বললাম। ডাঃ রায়চৌধুরীর কথাও বাদ দিলাম না।

আমার কথার ভিত্তিতে ইন্সপেক্টর সরকার মৃত মহিলাদের ছ'জন স্বামীকেই আবার জিজ্ঞাসাবাদ করল। তাদের তিনজন বলল, টিভি সারানোর লোক তাদের বাড়িতে এসেছিল। তবে কপাল খারাপ, দু'ক্ষেত্রেই তাদের বউরা টিভি সারানোর ব্যবস্থা করেছিল। মিস্ত্রি যখন এসেছিল তখন স্বামীরা বাইরে ছিল। ফলে কে কোথা থেকে এসেছিল তারা জানে না। অন্য দুজন স্বামী জানাল যে, তারা জানেই না বাড়িতে কোন টিভি সারানোর লোককে ডাকা হয়েছিল। তাদের স্ত্রীরা যখন মারা যায় তখন তারা কলকাতার বাইরে ছিল। তবে হতে পারে যে, তাদের বউরা টিভি সারানোর ব্যাপারটা বলতে ভুলে গিয়েছিল। ষষ্ঠজন জানাল, টিভি সারানোর লোকটিকে সে দেখেছে এবং আবার দেখলে মনে হয় চিনতে পারবে। সিদ্ধার্থর একটা ফটো জোগাড় করে তাকে দেখাতেই সে ওকে শনাক্ত করতে পারল। তখন সন্দেহজনক হিসেবে সিদ্ধার্থকে গ্রেপ্তার করা হল।

কিন্তু সিদ্ধার্থ কলকাতায় ফেরার আগেই ইন্সপেক্টর সরকার কাজ সেরে নিয়েছিল।

শুক্রবার একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে সরকার হাজির হল মায়ার বাড়িতে। প্রতিশ্রুতি মত আমাকে আড়ালও করল। হতচকিত মায়াকে সরকার বলল, কিছু মনে করবেন না, ম্যাডাম। আর ভয় পাওয়ারও তেমন কোন ব্যাপার নয়। আসলে আয়রনম্যানের হাতে খুন হওয়া একটা মেয়ের বাড়িতে আপনার স্বামী টিভি সারাতে গিয়েছিলেন। হয়তো অন্যদের বাড়িতেও গিয়ে থাকবেন। সেইজন্যেই পুলিশ আপনার স্বামীর টিভি সারানোর যন্ত্রপাতিগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখতে চায়।

মায়ার রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। তাছাড়া আমি ওকে ভরসা দিলাম। ও কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ও কী করে বুঝবে, এই সার্চ ওয়ারেন্টের মূলে আমি!

ছোট আলমারি ও তার ভেতরের প্লাস্টিকের বাক্সটা পাওয়া গেল জায়গামতই। তবে সিদ্ধার্থ আর পাঁচজনের বাড়িতে টিভি সারাতে গিয়েছিল কি না তার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না।

ছাদের ঘর থেকে কয়েকটা বড় রেঞ্চ আর হাতুড়ি নিয়ে নিল সরকার। বলল যে, ওগুলো ফোরেনসিক পরীক্ষা করে দেখা হবে।

শায়া আর ব্রেসিয়ারগুলো দেখে মায়া প্রথমটা অবাক হয়ে গেলেও খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। স্পষ্ট গলায় বলল, 'এগুলো আমার—'

কিন্তু সরকার ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, 'হতে পারে আপনার, কিন্তু আপাতত এগুলো আমরা নিয়ে যাব। যদি সত্যিই আপনার হয় তাহলে পরে ফেরত পাবেন।'

এরপর দিল্লী থেকে ফেরামাত্রই হাওড়া স্টেশন থেকে সিদ্ধার্থকে গ্রেপ্তার করা হল।

মায়া একেবারে ভেঙে পড়ল। আমি ভাবলাম, ওর আবার নার্ভাস ব্রেকডাউন না হয়ে যায়। ওকে আর টনিকে একা রাখা যায় না। তাই আমি ওর কাছেই থেকে গেলাম। খবর পেয়ে অলকও চলে এল। একদিন থেকে পরদিন ফিরে গেল বাড়িতে। বলে গেল, 'তোরা ভাবিস না, আমি অফিস থেকে ফেরার পথে রোজ একবার করে আসব।'

তার পরদিন নিউজ এডিটরকে বলে আমি আয়রনম্যানের ব্যাপার থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিতে চাইলাম। আমার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে অর্জি মঞ্জুর হল। তবে ভেতরে ভেতরে মারাত্মক কৌতূহল আমাকে খোঁচা মারছিল। তাই গোপনে ইন্সপেক্টর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চললাম।

সিদ্ধার্থই যে আয়রনম্যান সে-বিষয়ে সরকারের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তার কেসটা সাজাতে গেলে গোলমাল ধরা পড়ছিল বহু জায়গায়। যেমন, সিদ্ধার্থ যে ছ'জনের বাড়িতেই টিভি সারাতে গেছে তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদিও একটা বাড়ির কথা সিদ্ধার্থ প্রাথমিক জেরাতেই স্বীকার করেছে। সরকারের ধারণা, সিদ্ধার্থ খুব চালাক। যখন সে জানে যে তাকে কেউ শনাক্ত করে ফেলতে পারে, তখন আগেভাগেই সত্যি কথাটা বলে দিয়েছে। কোনরকম ঝুঁকি নেয়নি।

অবশ্য এটা ঠিক, আদালতে এ-ব্যাপারটা প্রমাণ করা অসম্ভব। তাছাড়া ছটা খুনই নিশ্চিতভাবে আয়রনম্যানের কাজ, এটাও প্রমাণ করা বেশ শক্ত। সুতরাং, দ্বিতীয় যদি কোনও খুনী থাকে, তাহলে এমনও হতে পারে, সিদ্ধার্থ হয়তো নিজের খেয়ালেই ওইসব শায়া আর ব্রেসিয়ার জোগাড় করেছে, কিন্তু কাউকে খুন করেনি।

খুনের রাতে কিংবা সন্ধ্যায় সিদ্ধার্থর অ্যালিবাই আছে কিনা সেটাও ইন্সপেক্টর সরকার খতিয়ে দেখছে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, এর নিষ্পত্তি করা সহজ নয়। সিদ্ধার্থ যেমন নিজের অ্যালিবাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারবে না, তেমনই পুলিশ বোধ হয় প্রমাণ করতে পারবে না সিদ্ধার্থ ছ'-ছ'টা অকুস্থলেই হাজির ছিল।

এতসব গোলমাল থাকা সত্ত্বেও ইন্সপেক্টর সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কেস দাঁড় করানো যাবে। বিশেষ করে ওই অ্যাসিড, তালা ছিটকিনি বা হুড়কো খোলার যন্ত্রপাতি—আসামীপক্ষের উকিল এসবের তেমন কোনও জুতসই ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। তাছাড়া সিদ্ধার্থর বাড়িতে দ্বিতীয়বার তল্লাশি চালিয়ে ওর পোশাকের আলমারিতে একপ্রস্ত কালো পোশাক পাওয়া গেছে। যে-ভদ্রমহিলা মাঝরাতে পিছন থেকে আয়রনম্যানকে দেখেছিলেন তাঁকে ডাকা হল টি. আই. প্যারেডে। বেশ কয়েকজন লোককে কালো পোশাক পরিয়ে আবছা আলোয় হেঁটে যেতে বলা হল। যে-ক'জনকে ভদ্রমহিলা সন্দেহভাজন বলে বেছে নিলেন তার মধ্যে সিদ্ধার্থও ছিল। তাছাড়া ওর মাথা গোলমালের কেস হিস্ট্রি থেকেও খানিকটা জোর পাওয়া যাবে।

সিদ্ধার্থ অ্যারেস্ট হওয়ার পর থেকে আমি মায়ার সামনে কখনও আয়রনম্যানের প্রসঙ্গ তুলিনি। বরং ও-ই সমানে উত্তেজিত হয়ে পুলিশ আর কাগজওয়ালাদের নামে সবসময় অভিযোগ করে গেছে। মায়া পুলিশকে যে-স্টেটমেন্ট দিয়েছে তাতে বেশ জোর দিয়েই বলেছে, আয়রনম্যানের খুনের দিনগুলোয় সিদ্ধার্থ ওর কাছে বাড়িতে ছিল। কিন্তু তার মধ্যে একটা দিন ছিল টনির জন্মদিনের পরের দিন। কাজল সেদিনটার কথা মনে রেখেছিল। ও বলেছে, সেদিন সিদ্ধার্থ সন্ধেবেলা বাড়ি ছিল না। বাড়ি ফিরেছে রাত এগারটায়। ব্যস, এই ব্যাপারটাই মায়ার বক্তব্যে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে।

প্রথমটা ভেঙে পড়লেও তিন-চারদিনের মধ্যেই মায়া বেশ সামলে উঠল। তারপর আমার সঙ্গে কোনরকম পরামর্শ না করেই কলকাতার খুব নামী ক্রিমিনাল লইয়ার যতীন বসুরায়কে সিদ্ধার্থর কেসের দায়িত্ব দিল। তবে তার সঙ্গে পরে যতবারই ও দেখা করতে গেছে, ততবারই আমি সঙ্গে গেছি। মায়া আর আপত্তি করেনি।

প্রথম প্রথম মায়া আমাকে খুব ভাল চোখে নেয়নি। হয়তো স্ক্রু-ড্রাইভার খোঁজার ঘটনাটা ওর মনে ছিল। তাছাড়া কাগজে আয়রনম্যান নিয়ে আমার লেখালেখির ব্যাপারটা তো ও জানতই। কিন্তু কয়েকদিন কেটে যাওয়ার পর ও সহজ হয়ে এল। বুঝতে পারল, ওর এই ব্যাপারে আমিও যথেষ্ট আপসেট হয়েছি। তাছাড়া আমি যে আয়রনম্যানের কেসটা আর রিপোর্ট করছি না, সে-কথাও জানিয়েছি ওকে।

মামলা আদালতে ওঠার দিন কুড়ি আগে আমি আর মায়া একদিন গেলাম মিস্টার বসুরায়ের

সঙ্গে শেষ জরুরী মিটিঙের জন্যে। সিদ্ধার্থর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে তিনি একটা ছক কষেছেন।

যতীন বসুরায়ের চেহারা গোলগাল, মাঝবয়েসী, বেশ ভুঁড়ি আছে। কিন্তু এগুলোই বোধ হয় তাঁর অস্ত্র। কারণ তাঁকে দেখলে বোকা বোকা মনে হয়। মায়াকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'আপনার স্বামীর এগেনস্টে যত এভিডেন্স পুলিশ জোগাড় করেছে সবই সারকামস্ট্যানশিয়াল। সুতরাং প্রসিকিউশানই আগে প্রমাণ করুক যে, আপনার স্বামী দোষী। ভাববেন না যে, আমি প্রমাণ করতে পারব আপনার স্বামী নির্দোষ। আমাদের কাজ হবে শুধু সংশয় তৈরি করে দেওয়া। দ্যাট উইল বি ইনাফ।'

'সেটা করবেন কী করে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রথমে ওই অ্যাসিড, স্টিলের পাত, নোজ প্লায়ার্স—ওগুলোর কথাই ধরা যাক। প্রসিকিউশান বলবে, ওগুলো দিয়ে দরজার ছিটকিনি, তালা কিংবা জানলার গ্রিল কেটে সিদ্ধার্থবাবু ভিকটিমদের ঘরে ঢুকতেন। আমরা বলব, ওগুলো টিভি বা ভি. সি. আর. সারানোর যন্ত্রপাতি। অ্যাসিড ঠিকমত ডাইলুট করে নিলে তা দিয়ে যন্ত্রপাতি সাফাইয়ের কাজ হতে পারে। তাছাড়া ইলেকট্রনিক সারকিট সারাইয়ের কাজে কতরকম টুল্‌স্ লাগে তার কি কোনও হিসেব আছে! সিদ্ধার্থবাবুই আমাকে বলেছেন, ওই স্টিলের পাত দিয়ে উনি ইলেকট্রিক্যাল কনট্যাক্ট টেস্ট করেন। আর তখন ইনসুলেশানের জন্য গ্লাভ্‌স্‌জোড়া খুব জরুরী।'

'আর ওই শায়া-টায়াগুলো?' আমি জানতে চাইলাম।

যতীন বসুরায় পাকা হাসি হাসলেন। বললেন, 'আগে তো পুলিশ প্রমাণ করুক ওগুলো আপনার বোনের নয়। যদি তা প্রমাণ করতে পারে তখন ওদের নেক্সট ঝামেলা হবে, ওগুলো যে ভিকটিমদের সেটা প্রমাণ করা। না, না, মিসেস রয় একদম ওরিড হবেন না। এ-কেসটায় এক লক্ষ লুপহোল্‌স রয়েছে।'

'কিন্তু প্রমাণ না করতে পারুক, ওগুলো সিদ্ধার্থর কাছে রয়েছে কেন সেটা তো জানতে চাইবে—মায়া জিজ্ঞেস করল।

ছাত্রছাত্রী বোকা-বোকা প্রশ্ন করলে পেশাদার মাস্টারমশাই যেভাবে অনুকম্পার হাসি হাসেন, বসুরায় ঠিক সেইভাবে হাসলেন। বললেন, 'ধরুন, শায়া আর ব্রা জমানোটা সিদ্ধার্থবাবুর হবি। কিংবা মেয়েদের অন্তর্বাস হাতের কাছে থাকলে তাঁর উত্তেজনা বাড়ে। জাজ আপনার স্বামীকে পাগল ভাবুক তাতে আমার কিস্যু যায় আসে না। আদালত আপনার স্বামীকে খুনী না ঠাওরালেই হল—তাতে আমি অন্তত খুশি। আশা করি আপনারাও হবেন।'

ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এও বুঝলাম, সিদ্ধার্থ যে খুন হওয়া মেয়ের বাড়িতে টিভি সারাতে গিয়েছিল সেটাকে নেহাত কাকতালীয় বলে প্রমাণ করার জন্যেও উনি যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করছেন।

কথাবার্তা শেষ করে যতীন বসুরায়ের চেম্বার থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম।

কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল, বেকসুর খালাস হতে সিদ্ধার্থর বেশ অসুবিধে হবে। যতীনবাবু সেটা হয়তো আঁচ করেছেন, তাই সংশয় তৈরি করে কেসটা ভণ্ডুল করতে চাইছেন। তাছাড়া মায়াকে হয়তো খানিকটা ভরসা দিতেও চেয়েছেন।

মায়াকে দেখে বুঝলাম, ও-ও সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। ওর ভুরুতে ভাঁজ, চোখ কোঁচকানো। যতীন বসুরায়ের কথার মধ্যে যে খানিকটা ফাঁকা আওয়াজ রয়েছে সেটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে ও। ওর গম্ভীর মুখ দেখে আমি আর কোনও আলোচনা করতে সাহস পেলাম না।

এর দু-দিন পরেই মায়া আমাকে বলল, ও একটু একা থাকতে চায়। তাছাড়া এখন ও ঠিক আছে। চিন্তা করার কিছু নেই। আর বাড়িতে বাবা আর অলকেরও তো অসুবিধে হচ্ছে।

আমি ওর ইশারা বুঝতে পারলাম। তাই ওকে বললাম, 'এ-বাড়ি তালা দিয়ে কাজল আর টনিকে নিয়ে তুই আমাদের বাড়ি চল—'

মায়ার মুখে কেমন একটা জেদ ছিল। বলল, 'না। ক'টা দিন আমি একটু একা থাকতে

চাই।'

অগত্যা তাই তল্পিতল্পা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। তবে একদিন অন্তর একদিন আমি আর অলক পালা করে ওর সঙ্গে দেখা করতে লাগলাম। এটুকু বুঝলাম, ও বেশ শক্ত ধাতের মেয়ে। এইরকম পরিস্থিতিতে আমি হলে কী করতাম কে জানে!

মামলা আদালতে ওঠার দু-দিন আগে আমাদের কাগজের দপ্তরে একটা ফোন এল। সল্ট লেকে একটা নৃশংস খুন হয়েছে। একটি বিবাহিত মেয়ে মারা গেছে।

অন্য কোনও কাজের ঝামেলা না থাকায় অ্যাসাইনমেণ্টটা নিলাম।

অকুস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে আমার চৈতন্য হল। এ তো সিদ্ধার্থর পাড়া!

তার একটু পরেই নির্দিষ্ট বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। মায়াদের ঠিক পাশের বাড়ি।

বাইরের ঘরে বেশ কয়েকজন পুলিশের লোক। তার মধ্যে ইন্সপেক্টর সরকারকেও দেখলাম। এছাড়া ডাক্তার, ফটোগ্রাফার, ল্যাবরেটরির লোকও রয়েছে।

ইন্সপেক্টর সরকার আমার কাছে এল। ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসা একজন বছর পঁয়ত্রিশের লোককে দেখিয়ে বলল, 'হাজব্যাণ্ড। আজ সকালেই বম্বে থেকে ফিরেছে।'

ভদ্রলোকের চুল উস্কোখুস্কো, বেশবাস ঠিক নেই। মুখে হতভম্ব ছাপ।

সরকার বলল, 'চলুন, ভেতরে চলুন—'

বেডরুমে এসেই বুঝলাম, আমি কোথায় এসেছি।

সেই ঘর। এই ঘরের জানলা দিয়ে মায়ার রান্নাঘরের জানলা দেখা যাচ্ছে। আর বিছানায় চিৎপাত হয়ে পড়ে রয়েছেন মিসেস কাপুর। পরনে নাইটি। মাথা চুরমার। একটা চোখ অক্ষত থেকে যাওয়ায় বীভৎস ভয়ঙ্কর লাগছে।

'দরজা বন্ধ দেখে মিস্টার কাপুর ধাক্কাধাক্কি করেন। তারপর দরজা ভেঙে এই অবস্থা দেখেন। ওদিকের জানলাটার গ্রিল কাটা। মনে হয়, মার্ডারার জানলা দিয়েই ঢুকেছিল। সেই একই গল্প : মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে খুন, স্বামীর কথা মত দুটো শায়া বোধ হয় মিসিং, আর একটা ব্রেসিয়ার। আর সেক্সুয়াল অ্যাসাল্টের কোন সাইন পাওয়া যায়নি।'

আমি মিসেস কাপুরের বীভৎস মৃতদেহ দেখছিলাম। অথচ যখন বেঁচে ছিলেন তখন কী সুন্দরীই না ছিলেন!

আমি সরকারকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে সিদ্ধার্থ... ?'

সরকার হাসল, বলল, 'বেসকুর খালাস, আর কী ? জেল-হাজতে বন্দী থেকে সে বেচারা কী করে মিসেস কাপুরকে খুন করবে ? এ আসল আয়রনম্যানের কাজ।'

ব্যস, গল্প শেষ।

সিদ্ধার্থ বেকসুর খালাস হয়ে গেল।

মায়া আর টনিকে নিয়ে ওর সুখের সংসার আবার সুখে ভরে উঠল।

এরপর আয়রনম্যান আর কোন খুন করেনি। কিন্তু ইদানীং একটা সন্দেহ আমার মনে মাথা চাড়া দিচ্ছে।

মায়া একবার বলেছিল, 'সিদ্ধার্থ যদি বদ্ধ পাগলও হয়, তাহলেও ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ওর জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি।'

মনে পড়ল, মায়া প্রায় বরাবরই যোগব্যায়াম চর্চা করে। ও হয়তো এমন কিছু শক্তিশালী নয়, তবে কোন মহিলাকে আচমকা কাবু করতে ওর তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মিসেস কাপুরকে তো নয়ই!

আর হাতুড়ি কি রেঞ্চ তো যে-কোনও দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়।

এর পরে ওদের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম। সেদিন টনি আমাকে খেলার জন্য হাত ধরে টানতে টানতে ছাদে নিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখি ছাদের ঘরে রাজ্যের আলমারি আর লেপতোশক সাজিয়ে রাখা। টিভি, ভি. সি. আর. সারানোর কোন কারখানার ছিটেফোঁটাও

সেখানে নেই। কখনও যে সেরকম ছিল তাও বোঝা যাচ্ছে না।

পরে মায়ার কাছে শুনলাম, সিদ্ধার্থ ওসব রিপেয়ারের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। কেন ছেড়ে দিয়েছে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হয়নি। হয়তো মায়াই জোর করে ছাড়িয়ে দিয়েছে। ও সাইকোলজি পড়া মেয়ে। ও জানে, মানসিক খুনীদের কী করে সামলাতে হয়। কী করে তাদের খুনের প্রবণতা দমিয়ে রাখা যায়।

শুধু একটা ব্যাপার খারাপ লাগছিল : মায়ার ভালবাসা বাঁচিয়ে রাখার জন্য মিসেস কাপুরকে মরতে হল।

